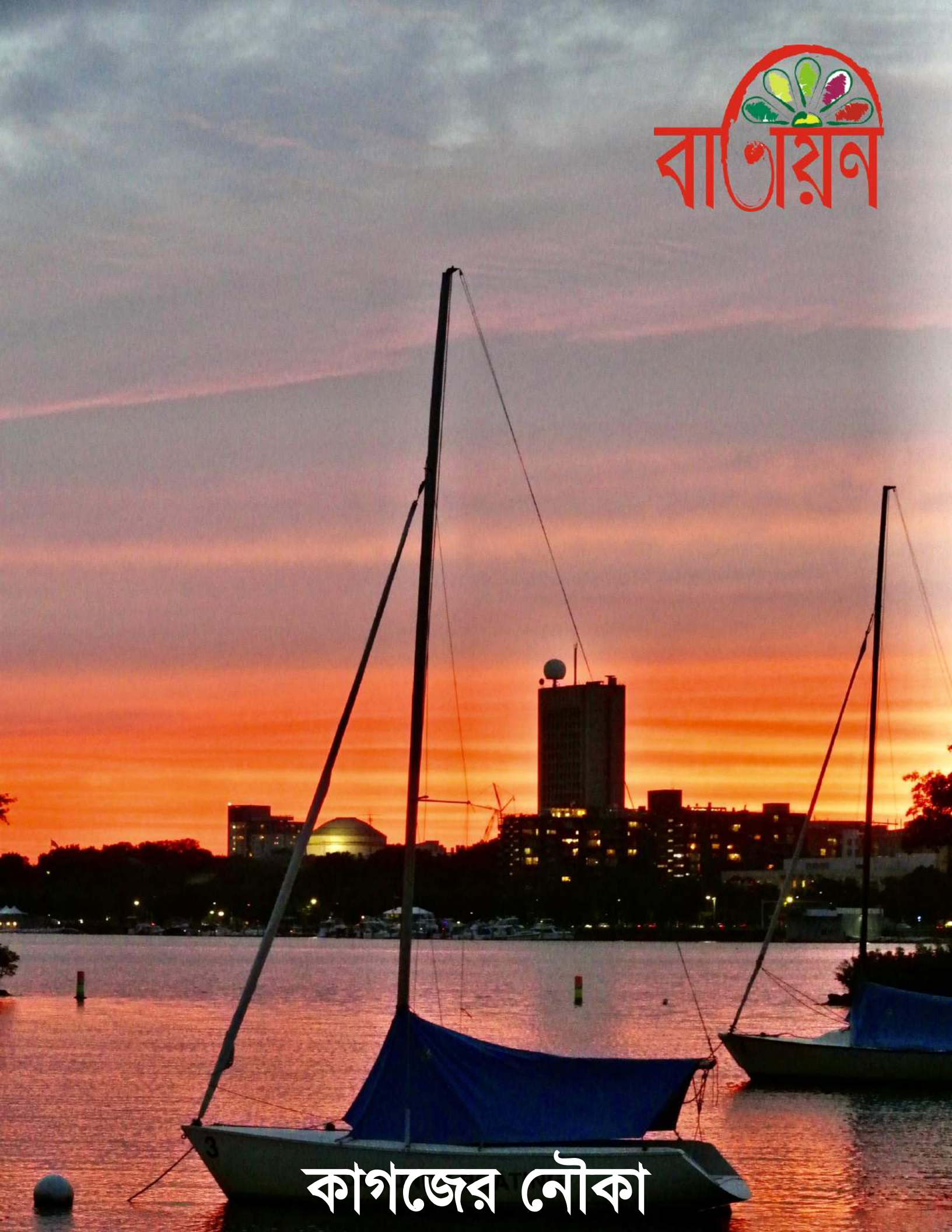

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

প্রতিচ্ছবি

নীল ? সে ভীষণ প্রিয়, ছিল সে জনপ্রিয়,
তোমার প্রতিচ্ছবি জানি,
আকাশ ? সে আজ বলে: "প্রতিচ্ছবিটুকু জলে"
স্মৃতির ছায়াছবি খানি ...

সঞ্জয়

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

১৮তম সংখ্যা, নভেম্বর ২০২১

সম্পাদনা

সঞ্জয় চক্রবর্তী

বাতায়ন

Issue Number 18 : November 2021

Editor
Sanjoy Chakraborty
Sydney

Group Editor
Ranjita Chattopadhyay
Chicago

Sub Editor
Sugandha Pramanik
Melbourne

Design and Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata

Website Design and Support
Susanta Nandi, Kolkata

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production
Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Suvra Das **Front Cover**

Shuvra Das is a Professor of Mechanical Engineering and lives in the greater Detroit area. He graduated from IIT Kharagpur in India and finished his PhD from Iowa State University. Photography, painting, writing, theater, and travel are some of his passions. Lately, he has been spending a lot of time in political activism.

Urmi Chakraborty **Inside Front Cover - Hawkesbury River, Sydney**

উর্মি চক্রবর্তী – ইকোনমিক্সের মাস্টার্স করার ঝকমারি সামলে পুরো দস্তুর নানা কাজে যুক্ত। সাথে রয়েছে শায়েরীর খাতা ও ক্যামেরা। বাতায়ন ও অন্যান্য অনলাইন ম্যাগাজিনে লেখালেখি অনেক দিনের। রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নজরুল গীতি'তে ডিপ্লোমা করা। তার লেখা লিরিক্সে গান করেছেন কলকাতার নামী শিল্পী'রা। বর্তমানে পাকাপাকি ভাবে সিডনি নিবাসী। রান্না করতে ও খাওয়াতে ভীষণ ভালোবাসেন। দেশ বিদেশের রকমারি রান্নার একটি ব্লগ চালান পাশাপাশি।

Supratik Mukherjee **Title Page - Flowers from the Garden**

অধমের নাম **সুপ্রতীক মুখার্জী** । পার্থিব বাসিন্দা । ৯টা-৫টার চাকর । পিদিমের মত টিম্‌টিমে বুদ্ধি, তা'ও নেভে না !!

Tirthankar Banerjee **Back Cover - Bidalup False, Pembertor**

His interest in photography started in student days. Much later the long nights in the dark-room were replaced by hours behind the computer and focus shifted from Black & White to Colour. He likes to show the images as they are and does not approve of computer gimmickry. He loves nature – flowers, birds, trees and all things beautiful. Tirthankar is an engineer, specializing in Renewable Energy and lives and works in Perth, Western Australia.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

কাগজের নৌকার অষ্টাদশ বজরা ভেসে এসে নোঙর করলো অবশেষে।

শ্রদ্ধেয় কবি জয় গোস্বামী লিখেছেন –

"তোমাকে ভাসাবো পূর্ণজলে
জোয়ারে – নৌকায় ...
তুমি বসে থাকবে ধার ঘেঁষে
আমি হবো দাঁড় হাতে মাঝি
সেসব কবে যে হবে, জানি না জানি না –
প্রাণ বলে: কাছে এসো আজ-ই"

তাই পাঠকের প্রাণের কাছে মননের কাছে এসে অবশেষে পৌঁছলো কাগজের নৌকা তার সাহিত্যের ভান্ডার নিয়ে।

কবি জীবনানন্দ লিখেছিলেন –

"... অশ্বত্থ পড়ে আছে ঘাসের ভিতরে
শুকনো মিয়ানো ছেঁড়া, অঘ্রান এসেছে আজ পৃথিবীর বনে
সে সবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে হেমন্ত এসেছে তবু ..."

দেশে এখন অঘ্রান, বাতাসে অল্প শীতের আমেজ। এখন নতুন শষ্য ওঠার সময়, নবান্নের সময়। কৃষকের আমন ধানের গোলা উপছে উঠবে এবার। সুদূর দেশ বিদেশে অবস্থিত লেখক লেখিকারা যারা সাহিত্যের প্রান্তরে নিরন্তর শষ্য বুনে চলেছেন সেই ফসলের ভান্ডার নিয়ে রইলো কাগজের নৌকার অষ্টাদশ সংখ্যা। সময়ের সাথে সাথে দ্রুত পরিবর্তীত পৃথিবীর আপামর পাঠকের সাহিত্য তৃষ্ণার উপশম ঘঠাতে। এবং ভবিষ্যতেও ঘটাবে নিশ্চিত।

আগামীর দিন, নতুন বছর সবার ভালো কাটুক এই আশা রাখি ।

সঞ্জয় চক্রবর্তী
২৩শে নভেম্বর
সিডনি

সূচীপত্র

ধারাবাহিক

শ্যামলী আচার্য	**সুখপাখি**	7
রমা জোয়ারদার	**চা-ঘর**	16
সৌমিত্র চক্রবর্তী	**সময়**	22
শকুন্তলা চৌধুরী	**পরবাসী**	31
প্রতীপ কুমার ভট্টাচার্য	**পুরোনো দিনের কথা**	43
প্রশান্ত চ্যাটার্জী	**সংরুর থেকে আম্বালা হয়ে চক্রতা-দিল্লী – Establishment 22**	47
পারিজাত ব্যানার্জী	**দশদিকে দিগন্ত !**	54
	এগারোর গেরো	55
	বারো দিনের আনন্দ বিধি	56
	তেরো নদীর লাগামছারা পার !	57
গৌরী দত্ত, মনীষা রায়, সুমিতা বসু, সুমিত নাগ	**ভান**	60
সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়	**চল নিধুবনে**	70

কবিতা

শঙ্খ ভৌমিক	**Uber উবাচ**	6
মানস ঘোষ	**জীবন যেমন**	5
	ট্রিগার	5
	টহল	5

মানস ঘোষ

জীবন যেমন

অনেক জীবন অনেক চলা, এগিয়ে পথে আবার ফেরা,
সমান্তরাল বিপ্রতীপে, ছাপায় দুকুল কোথাও চরা ।

আসা যাওয়ার পথের ধারে ওঠানামার নাগরদোলা,
ঢেউয়ের মাথায় নেচে বেড়ায় নোঙ্গরবিহীন শোলার ভেলা !

নোঙ্গরবিহীন স্বপ্নমায়ায় ভেসে বেড়ায় উল্টো-সোজা . . .
অজানা কোন দমকা হাওয়ায় উড়ছে দেখো জয়ধ্বজা !

কিসের জেতা, কিসের হারা ? কিসের অহং ? বিজয়কেতন ?
ঢেউয়ের তালে চলতে থাকা অনেকটা ঠিক জীবন যেমন . . .

ট্রিগার

কানের পাশে ঠেকিয়ে, চাপলাম ট্রিগার . . .

একবার . . . দুবার . . . তিনবার

পিস্তলে গুলি নেই জেনেও, বারবার

ধীরে ধীরে প্রশমিত হয় খুনে রাগ, শুধু থেকে যায়

কানের পাশে অগভীর ক্ষত

খসে পড়া পলেস্তারার মতো ।

টহল

সূত্রগুলো যোগ হয়না গরহাজিরা রোগে

যত্রতত্র শব্দগুলো অপুষ্টিতে ভোগে ।

বাঁধের ওপর থাকতো যদি তোমার নীরব টহল

অন্ত্যমিলের শ্বেতপাথরে সাজত যে তাজমহল !

মানস ঘোষ — মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করার পর, বেছে নেন, সমস্ত আবেগ, ভাবালুতা আর ব্যক্তিগত পরিসরকে তছনছ করে দেওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ এক পেশা, ভারতীয় রেলের ''ট্রেনচালক'' । এই গ্রহে উনিই প্রথম ট্রেনচালক যার একটি বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে । জীবিকা যাপন ও প্যাশনের এই পাহাড়প্রমাণ বৈপরীত্যের যন্ত্রণা কখনো তাঁকে স্তব্ধ করেছে, কখনো আবার আলোকিত বর্ণমালা নিয়ে হাজির হয়েছেন খোলা 'বাতায়ন' পাশে, আমাদের মাঝে ।

শঙ্খ ভৌমিক

Uber উবাচ

রাত দেড়টায় প্লেন নামলো । এয়ারপোর্ট সুনসান । বাইরে বরফকুচি ভাসছে । তুমি ক্লান্ত । বলেছ উবার ধরে বাড়ি ফিরতে । আমি অপেক্ষা করি । উবার বন্ধ । শেষ ট্রেন চলে গেছে গতকাল । ইতস্তত পুলিশের আনাগোনা । আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হচ্ছে । আমার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল সোনালী চুলের stewardess । আমি তোমায় ডাকি । তোমার ফোন নিস্তেজ । নিঃসঙ্গ বরফের আস্তরণ, নিয়ন আলো আর আমি জেগে থাকি । সময় ডানা মেলে উড়ে গেল । অতল শূন্যতাও ছুটি খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল । অগত্যা আমি পথে নামি । সঙ্গী সদ্যজাত বরফে আমার পায়ের ছাপ । আমি হাঁটতে থাকি । হাঁটতে থাকি । হাল্কা বরফের প্রলেপ ঢেকে যাচ্ছে আমার মুখ, চোখ । আমি কোনমতে হাতড়ে ঢুকে পড়ি তোমার স্বপ্নের মধ্যে ।

স্বপ্নের তুমি দিব্যি হাসিখুশি । লাল আঁচল পেতে বসে আছ আমি আসবো বলে । আমি রেগে গিয়ে বললাম ''এয়ারপোর্টে ফ্যা ফ্যা করে ঘুড়ে বেড়াচ্ছি, আসার নাম নেই তোমার ।'' তুমি মুচকি হেসে বললে, এই তো আসছি । তুমি ঘুরে দেখ ।'' আমি ঘাড় ঘুরিয়ে অবাক । আমি বাসস্টপে ক্লান্ত বিকেলবেলা । তুমি কলেজ ফেরত সাইকেলে-লাল ওড়না । আমার সামনে এসে সাইকেল থামিয়ে বললে ''কি হল, ওঠ । '' আমি বললাম ''পাগলি, তুমি খুব জ্বালাও ।'' মুচকি হাসি ঝুলিয়ে আমার চোখে চোখ রেখে বললে, ''কি করবো ? এত আগুন ।''

আমরা দুজনে অকাতরে ভিজলাম বাসস্টপে ।

শঙ্খ ভৌমিক – পেশায় অধ্যাপক; নেশায় নাট্যছাত্র ও সাহিত্যপ্রেমী । অভিবাসী জীবনের টুকরো যাপন নিয়ে কখনো নাটক, কখনো ছোট গল্প লেখা ।

শ্যামলী আচার্য

সুখপাখি

(১০)

দেওয়ানি আদালতে মোকদ্দমা। শহর জুড়ে কয়েকদিন ধরেই আলোচনা জোরদার। লাখুটিয়ার রাখালবাবু আর তাঁর ভাই বিহারীলাল আগেই যোগ দিয়েছেন ব্রাহ্মসমাজে। তাঁদের ছোট ভাই প্যারীলাল তখনও নাবালক। কিন্তু তিনিই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন ? দুই দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। গোল বাঁধল এবার অন্তঃপুরে। বিধবা মা ছেলেদের জাতধর্ম বিসর্জনের বিপক্ষে দাঁড়ালেন। সাধারণ অন্তঃপুরিকা হলে হয়ত অন্নজল ত্যাগ করতেন বা কুলদেবতার মন্দিরে গিয়ে হত্যে দিতেন। কিন্তু বরিশাল তার চড়া মেজাজের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। অতএব জমিদারগৃহিণী এবার নিজের ছেলেদের সম্পত্তির ভাগ দিতে অস্বীকার করলেন। জাত-ধর্ম খোয়াইলে মাইনসের আর থাকে কী ? সিধে দেওয়ানি আদালতে মামলা ঠুকলেন লাখুটিয়ার রায়চৌধুরী গৃহিণী।

শহরের সব উকিল মোক্তার মায়ের পক্ষে এককাট্টা। সকলেই মনেপ্রাণে চান, মায়ের ধর্মবোধের কাছে পরাস্ত হোন তিন পুত্র।

রাখালের বড় বাড় হইসে। ওই গোঁসাইরে লইয়্যা আইসে সিধা লাখুটিয়ায়। বেম্মগো বলিহারি।

রাখাল আর স্ত্রী সৌদামিনী ক্রমশ মোহিত হয়ে পড়েন ব্রাহ্ম ধর্মের তরুণ প্রচারক বিজয়কৃষ্ণের বাগ্মীতায়।

কলকাতা এবং শান্তিপুরে ব্রাহ্ম নেতা বিজয়ের নাম ইতিমধ্যেই সুপরিচিত। সৌদামিনী কানাঘুষোয় শুনেছেন এই মানুষটি নাকি শান্তিপুরের শ্রী অদ্বৈত আচার্যের বংশধর। সৌদামিনী নিজে এসব কথা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে আলোচনার ফুরসত পাননি একবারও। কিন্তু রাখাল রায়চৌধুরীর সঙ্গে সমাজের অন্যদের আলোচনা কানে এসেছে তাঁর। তাঁর তৃপ্তি একটাই। শান্তিপুরের তাঁতীরা যখন শাড়ির পাড়ে বিদ্যেসাগরকে ধন্য ধন্য করে নকশা তোলে, তখন এই মানুষটিই নাকি ছিলেন তাঁর সমর্থনে। বিদ্যাসাগর যখন বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে নেমেছেন, তখন সেই আন্দোলন সমর্থন করে ব্রাহ্মদের সহযোগিতায় সবচেয়ে বেশি মানুষ স্বাক্ষর করেছেন শান্তিপুর থেকে। সেই শান্তিপুরের বাসিন্দা! সৌদামিনী মনে মনে গর্বিত হন। এমন একজন মানুষ ... ইনি তো ঈশ্বরের সমতুল্য।

ব্রাহ্ম নেতা বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ামাত্র তাঁকে প্রণাম করতে উদ্যত হলেন সৌদামিনী। তাঁর স্বাভাবিক সংস্কার তাঁকে নত হতে শিখিয়েছে। বাধা দিলেন গোস্বামী।

করজোড়ে বললেন, "আমিও আপনারই মতো একজন। দুটি হাত-পা চোখ-কান নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচি। সবাই মানুষ। আমরা সব সহকর্মী। প্রণাম করেন কেন বৌঠান ?"

দৃপ্ত যুবকটির দুই চোখে সূর্যের তেজ, শরীর জুড়ে চাঁদের সুষমা।

অপ্রতিভ হন সৌদামিনী। পাশে রাখাল সহজ করে দেন পরিবেশ।

"চিন্তা কইরো না। হ্যারে আমরা মনে মনে অনেক বড় আসন দেই। মনের মধ্যেই পায়ে গড় কইরো। ঠিক বোজবেন। দ্যাখো না, চক্ষুদুইহান দিয়া বুক ফাড়তে লাগসেন ..."

স্মিত হাসেন বিজয়কৃষ্ণ। তিনি পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম আচার্য। ঢাকা শহরে রয়েছেন বেশ কিছুদিন যাবৎ। লাখুটিয়ার জমিদারবাবুর আমন্ত্রণে এই তাঁর প্রথম বরিশালে আসা।

"চলুন, কতা আচে অনেক। কাজ বাকি। সেগুলি একে একে করা জরুরি।"

ছিমছাম খাওয়ার আয়োজন। জুঁইফুলের মতো সাদা ভাত, নারকেল দেওয়া ডাল, পলতে পাতার বড়া আর শেষপাতে জলপাইয়ের চাটনি, সামান্য দই। মাছ ছুঁয়েও দেখলেন না বিজয়।

"গোস্বামীর বাড়ি, বুজলেন না ? ছেলেবেলা থেকেই নিরামিষভক্ষণের ওব্যেস।"

"তা'ও, সবই তো ফালাইয়া রাহলেন দেহি।"

সৌদামিনীর মৃদু কণ্ঠ বিজয়ের কান এড়ায় না। বরিশালের বাংলা ভাষার পাশে তাঁর শান্তিপুরী বাংলার মিষ্টি চলন তিনি ভারি উপভোগ করেন। ঢাকায় থাকাকালীন এই দেড়-দু'বছরে বাংলা প্রদেশের নানান শব্দ তাঁকে বিস্মিত করেছে। তবুও সব শব্দের অভ্যন্তরে অন্তর্নিহিত সেই ব্রহ্মের আভাস তাঁকে প্রাণিত করে। তিনি পাগলের মতো ছুটে চলেছেন শান্তিপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কলকাতা। গড়ে তুলছেন একের পর এক ব্রাহ্মধর্মের মন্দির। প্রত্যেকের কানে পৌঁছে দিচ্ছেন সেই ব্রহ্মের আহবান। তিনি এক, তিনি অসীম।

"শুনসি আপনে মেডিক্যাল কলেজ থিক্যা পড়া শ্যাষ না কইরাই এই কামে ভিড়সেন ? ঘরে কোন্দল কনর‍্যা আইলেন ক্যামনে ?"

রাখালের প্রশ্নে উচ্চহাস্য করে ওঠেন বিজয়।

"ঠিকই শুনেচেন। আমার পিতাঠাকুর ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁর গলায় ঝোলানো থাকত শালগ্রাম শিলা। সেই শিলার নামখানিও খাসা। শালগ্রামটির নাম হল দামোদর। পিতাঠাকুর তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সে সন্তানের মুখ দেখার আশা প্রায় ত্যাগ করেন। তাঁর দুই স্ত্রী, আমার দুই বিমাতা, তদ্দিনে পরপর পরলোকগমন করেচেন। তৃতীয় স্ত্রী আমার মাতাঠাকুরাণী। স্বর্ণময়ী দেব্যা। কতদিন হয়েচে তিনি শাসন করেচেন, আমার বড্ড এধার-ওধার দিক-বিদিক ঘুরে বেড়ানোর অব্যেস ছিল যে ... আটকে রাখতে পারতেন না। দেখেন, সেই অব্যেস আজও যায় নাই ..."

"অমন একখান হিঁদু বামুনের ঘরে বইস্যা গলার পৈতাহান ..."

"টাইন্যা ছিঁড়লাম ক্যামনে ? এমন জানতে চাইচেন রাখালবাবু ? সেই বাল্যকালে হেজল সায়েবের পাঠশালায় বাইবেল পড়েছিলুম যে। কলকেতার সংস্কৃত কালেজের পাঠটুকুও দেকে নিলুম। শান্তিপুরের বিখ্যাত গোবিন্দ ভটচাজের টোলই বলুন, আর কৃষ্ণগোপালের চতুষ্পাঠী, সংশয়ে মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল। উপনয়ন হল আমার। কুলপ্রথা অনুসারে আমার মাতাঠাকুরাণী দীক্ষা দিলেন আমায়। টোলে সংস্কৃত সাহিত্য পড়তে পড়তেই বেদান্ত পড়ার সাধ জাগল মনে। বাংলাদেশে তখন বেদান্তজ্ঞানী কোতায় পাই ? বড় ইচ্ছা হল, কাশী গিয়ে বেদান্ত পাঠ করব। মাতাঠাকুরাণী প্রথমে সম্মতি দেন নাই। তাঁর অনুমতি নিয়ে পদব্রজে রওনা হলুম কাশী। পাটনা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসি। এই হিঁদু শাস্তর পড়তে পড়তে ঘোর বৈদান্তিক হয়ে পড়লুম। অথচ এই আচার-আচরণে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলুম।"

রাখাল জিজ্ঞাসা করেন, "কলকেতার কালেজে গিয়েই তবে আপনার ভাব বদলায় ?"

"তা' সত্য নয়। পরিবর্তন হইত ঠিকই। অঘোর, অঘোরনাথ গুপ্ত ছিল আমার সহপাঠী। আমার নিবাস তখন কলকেতার সাঁতরাগাছিতে। পদব্রজে কালেজে যাই আর শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের সঙ্গে বেদান্তদর্শনে অবগাহন করি। সেই এক

ব্রহ্ম। এই প্রত্যক্ষ জড় জগত যা দেকচি, আমি দেকচি, আপনে দেকচেন, সবই মায়া। এর কিছুমাত্র সত্তা নাই। এই সময় আমি ঘোর বৈদান্তিক। তখন সমস্ত পদার্থই ব্রহ্ম। বিগ্রহ স্বীকার করতাম না।"

অদ্বৈতবংশের সন্তান বলে চলেন, "অথচ অদ্বৈতবাদী হয়ে আমার মনের শান্তি ছিল না রাখালবাবু। গেলুম সোজা দেবেন ঠাকুরের কাচে। কলকেতার জোড়াসাঁকো চেনেন ? সেইখেনে দ্যাকা করি তাঁর সঙ্গে। প্রথমদিন ছিল তাঁর বক্তৃতা ... পাপীর দুরবস্থা ও ঈশ্বরের অসীম দয়া। তারপর তো কেশব সেনের সঙ্গে দ্যাকা। সে আমায় পথ দেখালে। ... ব্রাহ্মধর্মে বলে, সকলেই এক ব্রহ্মের সন্তান। সকলে যদি একই পিতার সন্তান হই, তবে আর এত বিভেদ রাখার দরকারটা কী ? তারপর আর ব্রাহ্মণের উপবীত ছিঁড়তে কতক্ষণ ?"

সৌদামিনী বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকেন এই মানুষটির দিকে।

"বাল্যকাল থেকেই আমার বড় সুনাম ... বড়ই চঞ্চল ছিলুম। দৌরাত্মিতে কেউ পারত না আমার সঙ্গে ... অথচ বয়সে ছিলুম সকলের ছোট। নেতাগিরি করে বরাবরের অব্যেস। বিপদও কম আসেনি। একবার গয়নার লোভে চোরে আমায় চুরি করে। শুনেচি পথ ভুলে সে আমায় কোলে নিয়ে আমারই বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। আর একবার কুটুমবাড়িতে নিমন্ত্রণে গিয়েছি। এক ঘরে একলা শুয়ে ঘুমিয়েছিলুম। ডাকাত পড়ল সেইখেনে। কালীপুজোয় নরবলি দেবে বলে তারা আমারেই ঘুমন্ত অবস্থায় চুরি করে নে' যায়।"

শুনতে শুনতে শিউরে ওঠেন সৌদামিনী। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দেখেন উন্নতনাসা প্রশস্ত ললাটের মানুষটির মুখে কৌতুকের হাসি।

রাখাল অস্ফুটে বলেন, "তারপর?"

বিজয়কৃষ্ণ সজোরে হাসেন।

"তারপর আর কি ! এই যেমন দেখেন আমাকে চক্ষের সামনে ... এক পাগল দেখতে পায় তেমনি। সে ছুটে আসে ডাকাতদের মধ্যিখানে। পাগল তো ! তার আর ভয়ডর কীসের ? মাকালীর হাতের খাঁড়া নিয়েই সে আক্রমণ করে ডাকাতদের। তারা প্রাণভয়ে পালায়। আর আমার যেমন কপাল ... মায়ের পায়ে সেইদিনই আর জীবন উতসর্গ করা হল না। পাগলের পাল্লায় পড়ে ..." হা হা করে হেসে ওঠেন বিজয়কৃষ্ণ।

রাখাল হাঁফ ছাড়েন।

"শুনসি আপনের কিসু কিসু উদ্দণ্ডপনার কথা ..."

"জানেন রাখালবাবু, আমার দুই মা। একজন জন্ম দিলেন, তিনি আমার গর্ভধারিণী জননী। তাঁরে ডাকি মা-জননী। আর আমার জ্যাঠামহাশয় প্রণম্য গোপীমাধব গোস্বামী দত্তক নিলেন আমায়। তাঁর সহধর্মিনী কৃষ্ণমণি দেব্যারে ডাকি দুদুমা। তাঁদের প্রশ্রয়ে আদরে আমার শৈশব অতিক্রান্ত। তাঁদের মধ্যেই আমার ব্রহ্মদর্শন ঘটেচে।"

রাখাল বলেন, "কিন্তু এই বইরশালে শুদু তো মন্দিরের কাম না। ব্যাবাক অবস্থা খুব সঙ্গিন। মুরুব্বিগো জিগাইলে কয়, কেরমে হগগলই অইবে।"

"হবে নিশ্চয়। সময় লাগবে। চারপাশে বড় পাঁক রাখাল। চলেন, আমাদের অ্যাকন অনেক কাজ বাকি। হিঁদুয়ানির আচার বিচার থেকে সমাজকে মুক্ত করতেই হবে। আপনাদেরই যে সঙ্গে চাই।" কথা বলতে বলতে সৌদামিনীর দিকে ফিরে তাকান বিজয়কৃষ্ণ, "আপনাদেরও বৌঠান। একসঙ্গে কাজে লাগতে হবে। বড় মলিনতা, চারদিকে বড় কালিমা। অনেক আঁধার সরাতে হবে। এ কি কারও একার কাজ ?"

কথা বলতে বলতে জ্বলজ্বল করে ওঠে বিজয়কৃষ্ণের দুটি চোখ। শরীর থেকে কী এক উজ্জ্বল জ্যোতি। দীর্ঘদেহী মানুষটির ঋজু শরীরে ঝলসে ওঠে পৌরুষ ও প্রত্যয়।

"ইংরাজ রাজাগো লগেও নাকি কালেজে থাকতে কাইজ্যা করসেন ?"

রাখালের হাসিতে সারল্য আর ছেলেমানুষি।

"আমার তো সেই জন্মকাল হইতেই ইংরাজের সঙ্গে বিরোধ। জানেন না ?"

"হেয়া তো জানি না।"

"সে এক কাণ্ড। মাতাঠাকুরাণী আসন্নপ্রসবা। তিনি রয়েচেন শিকারপুরে, তাঁর পিত্রালয়ে। শিকারপুরে ছিল নীলকুঠি। নীলকর সায়েবের অত্যেচার চলত যকন-তকন। দিন নেই, রাত নেই এসে হানা দিচ্চে গেরস্তের ঘরে। সেদিন ঝুলনপূর্ণিমার রাত। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্চে চারদিক। এমন সময়ে গ্রামে নীলকর দস্যুগুলোর দাপাদাপি। মাতৃদেবী প্রাণভয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন কচুবনে। জ্যোতস্নার আলোয় সেই কচুবনেই জন্ম আমার। আমায় যে সেই জন্ম থেকেই ইংরেজ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে ... কী করি কন ?"

হেসে ওঠেন তিনজনে।

(১১)

"কুম্মিদ্দ্যা আইস ? খুইল্যা কও ... ঘেডি ধইর‍্যা লাডিদ্যা পিডাইতে কয়্যা গ্যাসেন তোমার পিতাঠাউর।"

"প্যানাপ্যাডো খ্যামা দ্যাও মা। ছিনার মইদ্য দিয়া কাইনাড়ী আইলাম। অমন কইরো না। পিতাঠাউররে তো জানো।" সদ্য গোঁফের রেখা উঠেছে কিশোরের। বিনোদিনীকে সে ডরায় ঠিকই, কিন্তু মুখে মুখে কথা কইতে ছাড়ে না। ঘাড়ত্যারা স্বভাবখান যাবে কোথায় ?

"এরহম আক্কইররা চাইয়া রইছ কা ?"

"তুই হাঙ্গাদিন কোম্মে থাহো আয় ? কি হরো ? তোরে বিছরাইতে বিছরাইতে মোর পরান বাইরাইয়া যায়।" ছেলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসেন বিনোদিনী, "দেহি ... তোর থুতমাডা এরহম হুগাইয়া গ্যাছে কা ?"

"হুদাহুদি পোতে ঘাডে আমোদেতে মাইত্তা ব্যাড়াই, এইডা কইতে চাও ?"

"পোলা নষ্ট হাডে আর ঝি নষ্ট ঘাডে। হুনসো কথাখান ? পুহুরে হাতোর দিয়া আসো।"

কাজ বেড়েছে। বেড়েছে দায়িত্ব। শুধু বংশধর পুত্রের দিকে নজর দিলে হয় না। আত্মীয়-পরিজন দাসদাসী তো আছেই, সঙ্গে জুড়েছে গ্রাম থেকে শহরে পড়তে আসা ছাত্রদের ভিড়। সকলেই জানে শহরে হোস্টেল মেস ছাত্রাবাসের চেয়ে বেশি আদর-যত্ন বনমালী গাঙ্গুলীর নিবাসে। অতএব নিত্যনতুন ছাত্রের ঢল শহরের এই বাড়িতে। বাড়ি অবারিতদ্বার। যে যখন খুশি আসে, খাবার জুটে যায়। প্রতিদিন সারা বেলা পাত পড়ে দেড়শো-দু'শো। গরিব অসহায় ছাত্রের জন্য কখনও হাতচিঠি, কখনও সামান্য মুখের কথা। "আপনার কাসে পাডাইলেন"। কে পাঠালেন, কাকে পাঠালেন, এসব প্রশ্ন অর্থহীন। বনমালীর কাছে শর্ত একটাই। থাকো, খাও, কিন্তু পড়াশোনায় ফাঁকি চলবে না। পরীক্ষায় ভালো ফল করে তবেই ছুটি।

বরিশালের ইস্কুলে পড়ে তারপর কেউ কেউ চলে যেত ঢাকায়। কেউ আবার কলকাতায়।

এইরকম এক ছাত্র ছিলেন বিধুভূষণ।

বিধুভূষণ বরিশালে এসেই আকৃষ্ট হলেন ব্রাহ্মধর্মে।

বিধবা মায়ের সঙ্গে মোকদ্দমায় জয় হয়েছে রাখালবাবু এবং তাঁর ভাইয়েদের। দেওয়ানি আদালতে শহরের প্রায় সমস্ত উকিল, মোক্তার সমর্থন করেছেন লাখুটিয়ার রায়চৌধুরী বাড়ির বিধবার কিন্তু নতুন উকিল দুর্গামোহন দাস একা লড়াই করলেন রাখালচন্দ্র এবং তাঁর ভাইয়েদের পক্ষে। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ার অপরাধে হিন্দু পরিবারের তিন সন্তানের আর সম্পত্তিচ্যুত হতে হল না।

মামলা জিতেই রাখালবাবুর পরবর্তী কাজ হল লাখুটিয়াতে একটি ভোজসভার আয়োজন। এই সভায় সকলকে সস্ত্রীক আহ্বান করা হল। তাঁর পিতার অবর্তমানে সেই আয়োজনে যোগ দিলেন শ্বেতাঙ্গ খ্রিস্টান এবং ব্রাহ্ম নারী-পুরুষ। এই সম্মিলিত ভোজের আয়োজনে তোলপাড় হয়ে উঠল সমস্ত বাংলাদেশ। হিন্দুসমাজে গেল গেল রব। রাখালবাবু এবং তাঁর বেম্ম বন্ধুরা শ্যাষে হিঁদুগো রসাতলে পাডাইতে চায়!

ইমন নোটবুকের পাতা উল্টোয় আলগোছে। ইতিহাসের পাতায় সব কথা লেখা নেই। সব কথা লেখা থাকে না। সকলের জীবনে বা সমস্ত পরিবারে কোনও একজন গল্পকার বা ঔপন্যাসিক থাকেন না যিনি সুন্দর করে গেঁথে রাখবেন সময়সারণি। অথচ প্রতিটি পরিবারে একেকটি সংসারে কত ওঠাপড়া, কত অপূর্ব গ্রন্থি আর ভাঙনের এলোমেলো দাগ।

সব যদি লিখে রাখা যেত।

বিধুভূষণ চাটুজ্যে খানিকটা লিখেছিলেন। তাঁর সেই ছেঁড়াখোঁড়া দিনলিপিতেই বহু খুঁটিনাটি বর্ণনা রয়েছে। তেমন আবার অনেকটাই নেই। কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। যতটুকু আছে তার মধ্যে থেকে ইমন লিখে নিয়েছে নিজের খাতায়।

বিধুভূষণের এই খাতাটি হাতে আসে অদ্ভুতভাবে। আশ্চর্য যোগাযোগ। ইমনের স্কুলের বন্ধু কৃষ্ণা। শুধু বন্ধু বলা ভুল। জানের জান, প্রাণের আধখান। কৃষ্ণাদের শরিকি বাড়িটি বিরাট। পুরনো বাড়ি হলেও প্রত্যেকে নিজেদের অংশ যত্ন করে সাজিয়েগুছিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করেন আর সেইজন্যেই বাড়িটিতে বড় মায়া। ইমনের চিরকালের বরিশাল অবসেশন তো আছেই, ইস্কুলেও খুব কাছের বন্ধুরা জানত, ইমন একদিন বরিশালে নিজের দ্যাশের বাড়ি খুঁজতে যাবে। কৃষ্ণার বাপ-ঠাকুর্দা নাকি ওই দেশের। সেসব জেনেশুনেই কেমন একটা আত্মীয়তাবোধ গড়ে ওঠে ইমনের মধ্যে। কৃষ্ণার বাড়িতে গ্রুপ স্টাডি করতে যাওয়া। একসঙ্গে পড়াশোনা। স্লিপ ওভার। মা বারণ করতেন না। ওদের বনেদি পরিবারে রক্ষণশীলতার বাড়াবাড়ি নেই, বরং আপ্যায়ণের আন্তরিকতা ভরপুর। ইমন থেকে গেছে কত রাতে। ইলেভেন-টুয়েলভের অঙ্ক কিংবা ফিজিক্স কেমিস্ট্রির নিয়মকানুন ফর্মুলার মধ্যে প্রাণের রসায়ন মিলেমিশে যেত।

কৃষ্ণাদের বাড়ির তিনতলার ওপরের চিলেকোঠার ছাদটি এক পরম আকর্ষণের জায়গা। চিলেকোঠা যেমন হয়। একটু ঘুপচি, অন্ধকার মতো। অনেক পুরনো ট্রাঙ্ক, চামড়ার সুটকেস আর কাঠের বাক্স। কৃষ্ণা আর পিঠোপিঠি জ্যাঠতুতো দিদি মালার কাজ ছিল টর্চ জ্বলে সেইসব সুটকেস আর ট্রাঙ্ক খুলে খুলে দেখা। ওদের কেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ওর মধ্যে খুঁজলে মোহর হিরে জহরত কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই। নিদেনপক্ষে সংকেত লেখা একটা খাতা। সেখানে গুপ্তধনের সংকেত লেখা আছে। ওরাই সেইসব আবিষ্কার করবে আর টপ করে বিখ্যাত হয়ে যাবে। ওদের বাড়িতে তখন সব লোকজন ভিড় করে দেখতে আসবে কী কী পাওয়া গেল।

ইমন সেদিন দুপুরে পড়তে গেছে। আগেরদিনই মালার মামা এসেছেন বর্ধমান থেকে। সীতাভোগ আর মিহিদানা এনেছেন হাঁড়ি ভর্তি করে। মালা, কৃষ্ণা আর ওদের খুড়তুতো ভাই বাচ্চু মিলে ঠিক করেছে সেই ফাঁকা হাঁড়ি রেখে আসবে ছাদে। হাঁড়িটা বেশ পরিষ্কার করে ধোওয়া হয়েছে। এবার শুকিয়ে-টুকিয়ে রেখে দেওয়া হবে। কালীপুজোয় বাজি ফাটানোর জন্য মাটির হাঁড়ি খুব দরকার। ওর ভেতরে কালীপটকা বা দোদোমা জ্বালিয়ে ফাটাতে পারলে অবিশ্বাস্য শব্দ হয়। ইমনও এইসব কাজে ওদের বিশ্বস্ত সঙ্গী।

"চ চ আর পড়তে হবে না। ছাদে যাই চ'।" মালা এসে ডাকে।

মালা বয়সে সামান্য বড়। ঠিক দিদিগিরি না ফলালেও একটা কর্তৃত্ব ওর মধ্যে সহজাত।

মালা না ডাকলে ওরা ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস ফেলে উঠে যাওয়ার অন্য কোনও ছুতো ঠিক খুঁজে নিত।

দুপুর রোদে দূরের বাড়িগুলো কেমন মরীচিকার মতো দুলতে থাকে আবছা হয়ে। একদিকে আচারের বয়াম রোদে দেওয়া। আমের আচার, কুলের আচার, তেঁতুলের আচার, পাতিলেবু জারানো। সব সারি দিয়ে রাখা। নিজেদের মধ্যে একবার চোখে চোখে ইশারা হয় তিনজনের। একটু আধটু আচার চাখতে না পারলে তিনজনের জিভের সব জল গড়িয়ে ছাদ ভেসে যাবে যে ! হাঁড়িগুলো জলের ট্যাঙ্কের কোনায় সাজিয়ে রেখে কিছুক্ষণ ছাদ-বাগানে রোদে কাহিল গাছগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে ওরা।

একটুকরো কুল মুখে পুরে চুষতে চুষতে কৃষ্ণা বলে, "সন্ধেবেলা এসে ভালো করে গাছগুলোতে জল দেব বুঝলি ? শক্তিকাকা একা আর এত পারে না। ও ইমন, কখন বাড়ি যাবি আজ? মাসিকে কী বলে এসেছিস ?"

"মা জানে, ছ'টার আগেই ফিরব। আজ আবার বাবা রাতে ফিজিক্স নিয়ে বসবে বলেছে।"

"উঃ, এত পড়িস না ভাই। এমনিই স্টার পাবি উচ্চ মাধ্যমিকে। এত পড়লে ফার্স্ট হয়ে যাবি শেষে।"

ইমন একটু উসখুস করে বলে, "চিলেকোঠার ঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ বসি চল, এখানে বড্ড রোদ।"

প্রস্তাবটা মনে ধরে সকলের।

চিলেকোঠা ঘরটি বড়। কিন্তু খুব অপরিচ্ছন্ন ধূলিধূসরিত নোংরা নয়। ঘুপচি, অন্ধকার হলেও মোটামুটি পরিষ্কার। বাড়ির বাচ্চাদের এই ঘরে আনাগোনা আছে জেনেই সপ্তাহে অন্তত একদিন ঝাঁটপাট পড়ে এই ঘরে। সব গোছানো। একটা দিকে দেওয়ালজোড়া তাকে বহু পুরনো পত্রিকা। ভারতবর্ষ, প্রবাসী, কল্লোল, পরিচয় ... সব কয়েকটি সংখ্যা একসঙ্গে করে বাঁধানো। আগেকার মানুষজন পত্রিকা পড়া হয়ে গেলে ফেলে দিতেন না। সংখ্যাগুলি এক করে যত্ন করে বাঁধাই করতেন। মলাট আলগা, বাঁধনের জোড় খুলেছে। ভেতরের পাতাগুলো হলুদ। কোনও কোনও পাতা একটু চাপ দিলেই ভেঙে যায়। এগুলো বিক্রিও হবে না। ছাদের রোদে ঝড়ে জলে বৃষ্টির পাশাপাশি থাকতে থাকতে একদিন আয়ুক্ষয় হবে। বাতাসে মিশে যাবে ধূলিকণা হয়ে।

ইমন দেখে মেঝের এক কোণায় একটা বিশাল জাম্বো সাইজের কালো ট্রাঙ্কের ডালা টেনে খুলছে মালা আর কৃষ্ণা দুজনে মিলে।

"ওটাতে কি আছে ?"

"কঙ্কাল ..." চোখ বড় বড় করে বলেই খিলখিল করে হেসে ওঠে মালা।

কৃষ্ণা বলে, "যাই বলিস, যেকোনও মানুষকে খুন করে স্বচ্ছন্দে এই ট্রাঙ্কে পুরে রেখে দেওয়া যায়। সাইজ দেখেছিস? বাপরে!"

"আমি কেবল ভাবি, ট্রাঙ্কটা কি ভর্তি অবস্থায় ছাদে তোলা হয়েছিল, না খালি অবস্থায় ? এটা বয়ে বয়ে ওপরে তুলেছিল কারা ? ক্রেন লাগা উচিত। বাপরে !"

ঘরে এই একটি ট্রাঙ্কই সবথেকে বড়। বাকিগুলো ছোট। সেগুলো একের পর এক চাপানো। এটি একলা এককোণে পড়ে আছে চুপচাপ। এর ওপরে আর কোনও ভার চাপানো নেই বলেই প্রত্যেকবার এটি খুলে একবার করে হাঁটকায় ওরা।

"এটা কার ট্রাঙ্ক রে ?"

"তা' জানি না ভাই। বড়জ্যাঠামশায় বলেছিলেন, এটাতে তাঁর ঠাকুর্দার সব জিনিসপত্র আছে। বরিশালে তিনি যখন পড়াশোনা করতেন, সেইসময়কার কলেজের নোটসও আছে। আমরা মাঝে মাঝে দেখি। সেই বাবা ঠাকুর্দার ডায়েরি আর চিঠিও আছে অনেক। কিন্তু গুপ্তধনের চিহ্নমাত্র নেই।"

বরিশাল শব্দটায় মনের ভেতর আনচান করে ওঠে ইমনের।

"একটু দেখাবি রে ? ওই ডায়েরি ?"

"এই তো। দেখ না।"

পর পর বেশ কিছু খাতা, বই, চিঠির বাণ্ডিল আর ডায়েরি। কালো চামড়া বাঁধানো একটা ডায়েরির প্রথম পাতায় মুক্তোর মতো হস্তাক্ষরে লেখা বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রথম পাতায় তারিখ পয়লা নভেম্বর, আঠারোশো উনআশি।

লেখা রয়েছে, 'আজ অতি পবিত্র দিন। লোকমুখে শুনিয়াছি ইতিপূর্বে ১৮৬৫ সালে বাবু চণ্ডীচরণ রায়চৌধুরী বরিশাল শহরের মধ্যস্থলে সম্পূর্ণ বিনা করে একখণ্ড ভূমি দান করিয়াছিলেন। আলেকান্দা নব ইস্কুলের নিকট দুর্গামোহনবাবু মন্দির স্থাপনের নিমিত্ত এককালীন পাঁচ শত টাকা প্রদান করেন। পঁয়ষট্টি সালে আজিকার পুণ্যদিনে এই মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। সামাজিক উপাসনার জন্য এই পৃথক গৃহটি দেখিয়া সমবেত সভ্যবৃন্দ সকলেই সহর্ষে উল্লাস করিয়া উঠেন। আমার পরম সৌভাগ্য এই একই তারিখে উপাসনা গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।'

ইমনের গায়ে কাঁটা দেয়। বাপরে এ কোন যুগের কথা ! অভিভূতের মতো পাতা ওল্টায় সে। হঠাৎ একটা পাতায় চোখ আটকে যায় তার।

তারিখ ১৮৯০ সালের পয়লা বৈশাখ। 'আজ হইতে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী গাঙ্গুলীর বাসস্থানে আশ্রয় পাইলাম। কল্য হইতে এইস্থান হইতেই বিদ্যালয়ে যাতায়াত করিব। দ্বিপ্রহরে আহার্য গ্রহণের সময় গৃহিণী স্বয়ং সম্মুখে দণ্ডায়মানা রহিলেন। সেই স্নিগ্ধ মাতৃভাব অবর্ণনীয়, স্মৃতিপটে চিরজাগরুক হইয়া থাকিবে।'

ইমন বিহ্বলের মতো বলে, "এই ডায়েরিটা আমাকে একবার পড়তে দিবি কৃষ্ণা ?"

(১২)

"বরিশালের বিধবা-বিবাহের কথা শুনেছ মণি ?"

"না বৌঠান, শুনি নাই। আপনের পরিবারেই ?"

"না না মণি, আমার পরিবারে তখনও নয়, তবে আমাদের পরবর্তীকালে বিধবা-বিবাহ হয়েছে বটে। কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন সতীন্দ্রনাথ সেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ ভাবশিষ্য ছিলেন বিনোদবিহারী কাঞ্জিলাল। তিনি বিয়ে করেছিলেন আমার মায়ের পিসতুতো দিদিকে। পিসিমা ছিলেন বিধবা। মায়েরা তাঁকে ডাকতেন খুকুমা। খুকুমার একমাত্র কন্যা, মায়েদের এই পিসতুতো দিদিও বাল্যবিধবা। তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে অবশ্য হয়েছে কলকাতা শহরে। হাজরায় কংগ্রেস কার্যালয়ে বিনোদবিহারী কাঞ্জিলালের সেই বিয়েতে বহু বিশিষ্ট মানুষ এসেছিলেন। থালাভর্তি করে মিষ্টি খাওয়ানো হয়েছিল সকলকে। আমি সেই বিয়ের কথা বলছি না মণি, আমি বলছি আঠারোশো সাতষট্টি সালের কথা।"

কীর্তনখোলা নদীর ধার ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতেই বাড়ি ফিরেছে দুজনে। দুপুরে আরেকবার বেরনো। বনমালী গাঙ্গুলীর বাড়ি, সদর গার্লস স্কুল, বি এম স্কুল আর বি এম কলেজ যাওয়ার পরিকল্পনা। সেই ফাঁকে আরও একবার পিছনে ফিরে তাকানো।

বরিশালের ব্রাহ্মসমাজে কিছু না কিছু বৈপ্লবিক কাজকর্ম ঘটতেই থাকত। দুর্গামোহনবাবু ছিলেন অত্যন্ত দুঃসাহসী মানুষ। তাঁর স্ত্রী ব্রহ্মময়ীরও তেজ ছিল অসামান্য। রাখালবাবুর সহধর্মিনী সৌদামিনীও ছিলেন একইরকম। তেজস্বিনী এবং স্বামীর ধর্মের অনুগামিনী। ব্রাহ্মসমাজে সেইসময় বিক্রমপুরের গিরীশচন্দ্র মজুমদার, সর্বানন্দ দাশ ও ডাক্তার আনন্দচরণ খাস্তগীর দুর্গামোহনের সাথে যোগ দেন। বরিশালের ব্রাহ্ম সমাজের অগ্রগতির ইতিহাসে তারা বিশেষ অবদান রেখেছেন। ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি হলেন দুর্গামোহন দাশ, সম্পাদক সর্বানন্দ দাশ, প্রচারক গিরীশচন্দ্র মজুমদার এবং কার্যকরী সমিতির সদস্য স্কুলের হেডমাষ্টার জগবন্ধু সাহা। ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতাদের ওপর বহু নির্যাতন নেমে আসে। তাদের সমাজচ্যুত এবং একঘরে করা হয়। এই সংগ্রামের দিনে বরিশালের ব্রাহ্ম মহিলারা কুসংস্কার দূরীকরণে অগ্রণী হয়েছিলেন। রাখালবাবুর স্ত্রী সৌদামিনী দেবী, দুর্গামোহনের স্ত্রী ব্রহ্মময়ী দেবী, গিরীশবাবুর স্ত্রী মনোরমা মজুমদার এবং মুক্তকেশী গুপ্ত প্রকাশ্যভাবে স্ত্রী শিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেন। দুর্গামোহন দাশ বরিশাল ছেড়ে কলকাতায় ওকালতি করতে যান। দুর্গামোহনের পর জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার জগবন্ধু লাহা ব্রাহ্ম সমাজের পরিচালনার ভার নেন। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা।

"রাখালবাবুর ছোটবোনের বিয়ে হয়েছিল ব্রাহ্মপদ্ধতিতে। সাতষট্টি সালের কথা বলছি। বনমালী গাঙ্গুলী তখন ছ'সাত বছরের বালক। কিন্তু বরিশালের হিন্দু সমাজে তোলপাড় শুরু হয়। দীনতারিণী দেবীর বিয়ে হয় ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কেশব সেন কলকাতা থেকে নিজে এসেছিলেন লাখুটিয়া গ্রামে। তিনিই ছিলেন এই ব্রাহ্মবিবাহের আচার্য।

"এই পর্যন্ত ঠিক ছিল সব। গোল বাঁধল দুর্গামোহনের বিমাতার বিবাহ নিয়ে।"

"বিমাতা ? কয়েন কি বৌঠান ? পোলায় তার সৎ মায়ের বিয়া দিল ?"

"তাছাড়া কী ? পিতা গত হয়েছেন, সৎ মায়ের বয়স নিশ্চয়ই অল্পই ছিল। হিন্দু ঘরের বিধবাদের অসহনীয় অবস্থা নিয়ে তো কিছু বলার নেই। বিদ্যাসাগরের জন্য আইন পাশ হয়েছে, ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কারকরা এই সুযোগ ছাড়তে চাইলেন না। দুর্গামোহন তাঁর বিধবা বিমাতার বিয়ে দিলেন জগৎচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে। এই বিয়ে হল ব্রাহ্মমতে। আর এখানেই শেষ নয়। মুক্তকেশীর বড়ভাই ঈশ্বরচন্দ্র সেনের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হল আরেক বিধবা আনন্দময়ীর।"

"সেই যুগে অত কাণ্ড হইল, ঢিল পাটকেল পড়ে নাই ?"

"পড়বে না আবার ? দুর্গামোহনকে একঘরে করে রাখা হল। তাঁর জ্ঞাতিরা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা ত্যাজ্য করলেন তাঁকে। পাড়া প্রতিবেশীদের নির্যাতন মাত্রা ছাড়াল। অত বড় পসার যে নামী উকিলের, তার মক্কেলের সংখ্যা কমতে লাগল হু হু করে। রাস্তায় বেরোলেই কেউ ধুলো ছোঁড়ে, কেউ পাথর ছোঁড়ে। আর সেই সঙ্গে বাক্যবাণ। বরিশালের সেই মধুর ভাষার অশ্রাব্য ঝাঁজালো গালিবর্ষণেও যে দুর্গামোহন অটল থাকতে পেরেছেন, সে তার চরিত্রের দৃঢ়তা। শুনেছি বিমাতাকে বিয়ে দেওয়া এক জঘন্য মনোবৃত্তি বলে তাঁকে নিয়ে কুৎসিত সব গান বাঁধা হয়েছে।"

বলতে বলতে হাতের ডায়েরিটা উলটে দেখে ইমন। দুর্গামোহন কোনও কিছুতেই বিচলিত হননি। আসলে সময়ের আগে এগিয়ে যাঁরা সমাজবদলের জন্য সম্মার্জনী হাতে নেন, তাঁদের দমিয়ে ফেলা বড় সহজ কথা নয়। বরিশালের সমস্ত ব্রাহ্ম মহিলা তখন সংস্কারের পক্ষে একজোট হয়ে দাঁড়িয়েছেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো মানুষ একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন, নারীসমাজের এই অকুণ্ঠ অগ্রগতি বাংলাদেশে আর কোথাও এমন বিশেষভাবে লক্ষিত হয়নি।

সৌদামিনী ব্রাহ্ম মন্দিরের উপাসনায় নিয়মিত গান করতেন। বামাবোধিনী পত্রিকায় লিখতেন প্রবন্ধ। এমনকি স্বামী রাখালচন্দ্রের সঙ্গে কলকাতার সিঁদুরেপট্টিতে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় সঙ্গীত পরিবেশন করে অকুণ্ঠ সাধুবাদ লাভ করেন।

এই সভার আহ্বায়ক ছিলেন স্বয়ং কেশবচন্দ্র সেন। শুধু সৌদামিনী কেন, একাশি সালে মনোরমা মজুমদার আরও বড় এক বৈপ্লবিক কাজ করেছিলেন। অন্তঃপুরের মহিলাদের ধর্মশিক্ষা দেবার উদ্দেশে তিনি হন ধর্মপ্রচারিকা। মাঝে মধ্যে ব্রাহ্ম মন্দিরের বেদীতে বসে উপদেশ দিতেন। দলে দলে লোক তাঁর উপদেশ শুনতে আসত। সে এক আশ্চর্য উদ্দীপনা। সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে মহিলাদের পক্ষে আচার্যের কাজ সেই প্রথম। বরিশাল এই ঘটনাতেও স্বাক্ষর রাখল তার।

দুর্গামোহন সাতষট্টি সালে একবার কলকাতায় যান। সেখান থেকে বরিশালে নিয়ে এলেন নিখিল ভারত ব্রাহ্মসমাজের তিন প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অঘোরনাথ গুপ্ত আর যদুনাথ চক্রবর্তীকে। গোঁসাইজী এই দ্বিতীয়বার এলেন বরিশালে। এঁরা সকলেই সেবার বরিশালে এসেছেন সপরিবারে। গোঁসাইজী আর অঘোরনাথ বরিশাল থেকে চলে গেলেন অন্যত্র। প্রচারকাজে তাঁরা তখন পূর্ববঙ্গ চষে বেড়াচ্ছেন।

যদুনাথ চক্রবর্তী বরিশালে একটি ইস্কুল শুরু করেন সেই সময়। প্রতিদিন দুপুরে ইস্কুল। বয়স্কা ব্রাহ্ম মহিলারা সেখানে আসবেন, লেখাপড়া শিখবেন, হাতের কাজ শিখবেন। এমনটাই উদ্দেশ্য। জজসাহেব বেলফুরের মেমসাহেব আসতেন মেয়েদের সূচের সেলাই আর কার্পেটের কাজ শেখাতে। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সারির প্রচারক এবং সভ্যদের অন্দরমহল থেকে মেয়েদের ভিড় হত সবথেকে বেশি। যে কোনও আলো ছড়িয়ে পড়ে শুধু অন্ধকারকে ফিকে করতে। কাজেই মিশনারিদের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা নিয়ে সৌদামিনী ব্রহ্মময়ীরাও পথ দেখালেন আরও অনেক মেয়েদের। তাঁদের দেখাদেখি নতুন উদ্দীপনায় মেয়েরা আলোর পথে এগিয়ে এলেন। দু'তিন বছরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা হল নারীকল্যাণ সভার। এই সভার উদ্যোগে মেয়েদের বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া শুরু হল। শুধু তা'ই নয়, পরীক্ষার শেষে পারিতোষিক, পুরস্কার চালু হল। এতে উৎসাহী হয়ে আরও অনেক মেয়েরা এগিয়ে আসেন।

এই সভাই পরবর্তীকালে হয়ে যায় বাখরগঞ্জ হিতসাধিনী সভা।

কয়েক বছর পরে ব্রহ্মনিষ্ঠ সর্বানন্দ দাশ একটি বালিকা বিদ্যালয় তৈরি করেন। সেটি পরবর্তীকালে সরকারি সাহায্য পায়। তখন সেটি হাইস্কুল। বরিশাল জেলার সদর গার্লস হাইস্কুলের এভাবেই গোড়াপত্তন। সর্বানন্দের নাতি ঠিকই লিখেছিলেন, 'এই পথে আলো জ্বেলে এই পথে পৃথিবীর ক্রমোন্নতি হয় ...'

কিন্তু ব্রাহ্মদের ওপর সেইসময় হিন্দুসমাজের উৎপীড়ন বন্ধ হয়নি। তাঁরা না পেতেন গৃহভৃত্য, না কোনও পাচক, না ধোবা।

সত্য প্রেম পবিত্রতা নিয়ে ছাত্র আর যুবসমাজকে এর পরে যিনি উদবুদ্ধ করেন, তিনিই অশ্বিনীকুমার দত্ত। একই সময়ে বানারিপাড়া গ্রামের মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা সপরিবারে যোগ দেন ব্রাহ্মসমাজে। নব্বই সালে তিনি যখন ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় প্রচারক নিযুক্ত হলেন, তাঁর বাগ্মীতায় আকৃষ্ট হলেন বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

বিধুভূষণের দিনলিপিতে স্পষ্ট হয়েছে ব্রাহ্মসমাজের সংকটকালের কথা।

(চলবে)

শ্যামলী আচার্য – কর্মসূত্রে 'আজকাল', 'আবার যুগান্তর', 'খবর ৩৬৫' ও অন্যান্য বহু পত্র-পত্রিকায় এবং ওয়েবজিনে ফিচার এবং কভারস্টোরি লেখার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। 'একদিন' পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদক হিসেবে কাজের সুযোগ। গাংচিল প্রকাশনা থেকে তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'অসমাপ্ত চিত্রনাট্য'; সংকলনের গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকা, সানন্দা, এই সময়, তথ্যকেন্দ্র পত্রিকায় প্রকাশিত। "রা" প্রকাশন থেকে তাঁর দ্বিতীয় গল্প সংকলন 'প্রেমের ১২টা'; সংকলনের গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকা, সানন্দা, উনিশ-কুড়ি, একদিন, প্রাত্যহিক খবর এবং বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত। বহুস্বর পত্রিকার পক্ষ থেকে মৌলিক গল্প রচনায় 'অনন্তকুমার সরকার স্মৃতি পুরস্কার'। অভিযান পাবলিশার্স আয়োজিত মহাভারতের বিষয়ভিত্তিক মৌলিক গল্প রচনায় প্রথম পুরস্কার। এছাড়াও গবেষণাঋদ্ধ বই 'শান্তিনিকেতন'। প্রকাশক 'দাঁড়াবার জায়গা'। ১৯৯৮ সাল থেকে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের এফ এম রেইনবো (১০৭ মেগাহার্তজ) ও এফ এম গোল্ড প্রচারতরঙ্গে বাংলা অনুষ্ঠান উপস্থাপিকা। কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের ভয়েস ওভার আর্টিস্ট।

ধারাবাহিক

রমা জোয়ারদার

চা-ঘর

পর্ব ১২

[পূর্ব কথাঃ রাতে প্রায় খালি দোকানে বসে জিতেন দাস তাদের অতীত জীবনের কথা ভাবছিল। স্ত্রী রমলা আর ছেলে বাবানকে নিয়ে তার কত সুখের সংসার ছিল! কিন্তু, আঠেরো বছর আগে, কী দুর্ভাগ্য! হঠাৎ কদিনের জ্বরে ভুগে তাদের তরতাজা চোদ্দো বছরের ছেলে বাবান চিরবিদায় নিল। তারপরই শরীর, মন ভেঙে গিয়ে রমলা অসুস্থ হয়ে পড়ল। সেই অসুস্থতা বাড়তে বাড়তে আজ সে শয্যাশায়ী।

এই সময়ে ঝুনঝুনওয়ালার ম্যানেজার, মিহির দত্ত চা-ঘরে ঢুকল। মিহির আগেও তাদের রেসর্টের জন্য জিতেন দাসকে চা-ঘর বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছে। জিতেন দোকানটা ছাড়তে রাজী নয়। বাবানকে হারানোর পর, এই চা-ঘরই তার বেঁচে থাকার একমাত্র রসদ। এই দোকানের সূত্র ধরে সে অনেক মানুষের সাথে জড়িয়ে আছে। কিন্তু মিহির দত্ত দোকানের ওই জমির জন্য জিতেনকে প্রলোভন এবং ভয় দেখাতে থাকে।

একদিন আনন্দী আর নিখিলেশ চা-ঘরে এল। নিখিলেশ বলল দুদিন পর রঘু আর আনন্দীকে সে কলেজ স্ট্রীটে নিয়ে যাবে তাদের দরকারি বইপত্র কিনে দেবার জন্য। তারা একসাথে লাঞ্চ সেরে ফিরবে। ওদের সাথে যেতে রঘু প্রথমে ইতস্ততঃ করছিল। কিন্তু শেষ-মেশ নিখিলেশের প্রস্তাবে রাজী হল। সেদিনই রঘু প্রথম জানল, নিখিলেশ কার্গিলের যুদ্ধে একটা পা হারিয়েছে, কিন্তু ফাইটিং স্পিরিট হারায়নি। রঘু শ্রদ্ধাবনত চিত্তে নতুন ভাবে নিখিলেশ কে চিনল।]

নিখিলেশ রঘুকে চা-ঘরের সামনে নামিয়ে দিল। বইয়ের ব্যাগ হাতে নিয়ে রঘু হাসিমুখে চলন্ত গাড়ির দিকে তাকিয়ে নিখিলেশ আর আনন্দীকে হাত নেড়ে দিল। শেষ দুপুরের রোদে কালিচকের রাস্তা ঘাট তখনও ঝিমোচ্ছে।

চা-ঘরে ঢুকতেই বিরজু রঘুর কাছে এসে, ওর হাতের ব্যাগটা ফাঁক করে দেখে বলল – 'কত্ত কিতাব ! সব পড়বে ?' রঘু হেসে মাথা নাড়ল – 'দেখি ! ইচ্ছে তো আছে পড়ার।'

এবার সুর পাল্টে বিরজু বলল – 'জানো তো রঘুদা, আজ এখানে একটা হাঙ্গামা হয়েছে।'

শোয়া থেকে উঠে বসে বাদল বলল – 'ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই শুরু করে দিলি বিরজু ?'

থতমত খেয়ে গেল বিরজু – 'রঘুদাকে কিছু বলব না ?'

হাতের ব্যাগ নামিয়ে রেখে টান টান হয়ে বসে রঘু জিজ্ঞাসা করল – 'কি হয়েছে ? খুলে বল। চেপে যাচ্ছিস কেন ?'

বাদল উঠে দাঁড়ায় – চেপে যাব কেন ? তেমন কিছু তো নয় ! আর, জানতে তো তুমি পারবেই। আজ তুমি বেরিয়ে যাবার ঘন্টা খানেক পর নতুন পাড়ার সুজন সাহা আর হেবো গুন্ডা এসেছিল এখানে।'

ভুরু কুঁচকে রঘু বাদলের দিকে তাকালো – কেন ? ওরা এখানে কি করতে এসেছিল ?'

ওদের দিকে পাশ ঘুরে, শুয়ে শুয়েই উত্তর দিল মুরারী – কেন আবার ? ঝামেলা পাকাতে এসেছিল। ওটাই তো ওদের কাজ !'

– 'তারপর ? কি করল ?'

– মস্তানী করছিল। ভয় দেখাচ্ছিল আমাদের।' চোখ বড় বড় করে গম্ভীরভাবে বলল বিরজু।

– 'ভয় দেখাচ্ছিল, মানে ? কিসের ভয় ? দাদু কোথায় ছিল ?'

বিরজুকে থামিয়ে বাদল বলে উঠল – 'আরে, বিরজুটাও তো সেরকম ! ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর ওরাও জিজ্ঞাসা করছে, দোকানে কতজন কাজ করে, কত মাইনে এইসব। তারপর বলছিল, এই দোকান উঠে যাবে। এরকম নানা কথা।'

মুরারি উঠে বসল, 'আরে সুজন সাহা তো ওই ঝুনঝুনওয়ালার ম্যানেজারের স্যাঙাৎ। ওরা এই চা-ঘর তুলে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। শয়তান যত সব !'

বাদল আবার বলল – 'বিরজুকে যখন এই সব বলছিল, তখন সীতারাম দাদা কিছু একটা গণ্ডগোল আন্দাজ করে ওর মোটা লাঠিটা নিয়ে মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।'

ওদের কথা শুনতে শুনতে উত্তেজিত হয়ে রঘু প্রশ্ন করল – 'কিন্তু দাদু কোথায় ছিল ? দাদু কিছু বলল না ?'

– 'দাদু আজ আসেনি। দিদিমার শরীর আবার খুব খারাপ হয়েছে।' বাদল উত্তর দেয়।

কথায় কথায় সবটাই জেনে ফেলে রঘু। সুজন আর হেবো একটা গণ্ডগোল করার উদ্দেশ্য নিয়েই। এসেছিল। চীৎকার চেঁচামেচি করে বলতে থাকে, আমরা জানি এখানে সব উল্টোপাল্টা কাজ কারবার হচ্ছে। এসব আমরা চলতে দেবো না। চা-ঘরে তখন ব্যাঙ্কের দুজন ভদ্রলোক ছাড়া আর কেউ ছিল না। ওদের চেঁচামেচিতে ঘাবড়ে গিয়ে তারাও পয়সা দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায়। ওদিকে, পেট্রল পাম্প আর এদিক-ওদিকের কিছু লোকজন ভীড় করে মজা দেখতে দাঁড়িয়ে গেল। সেই সময় বাদল বুদ্ধি করে জিতেন দাসকে ফোন করে দোকানের পরিস্থিতি সবটা জানিয়ে দেয়। এইসময়ে আবার রাণাঘাটের বাসটা এসে থামল। রোজকার মত কিছু লোকজন নেমে চা-ঘরে আসছিল। কিন্তু গণ্ডগোল দেখে সব থমকে গেল। কেউ কেউ ফিরেও গেল। অন্য দিকে বাদলের ফোন পেয়ে জিতেন দাস কালিচকের থানার সাথে কথা বলেছিল। শেষ পর্যন্ত পুলিশ এল চা-ঘরে। কিন্তু ততক্ষণে সুজন সাহা আর হেবো চলে গিয়েছে।

সব শুনে রঘু বলল – 'সীতারামদা ওদেরকে কিছু বলল না ?'

বুক ফুলিয়ে সামনে এগিয়ে এল বিরজু – 'বলেছে তো ! চাচা অনেক বকলো ওদের। মোটা লাঠি ঠুকে ঠুকে বলল, তোমরা ঝুটমুট কা ঝামেলা করছো এখানে। এখনই চলে যাও।'

বিরজুর কথার মাঝখানে রঘুর মোবাইল বেজে উঠল। রঘু ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে অঙ্কিত জিজ্ঞাসা করল – 'কিরে ? ফিরে এসেছিস তুই ?'

– হ্যাঁ, কিছুক্ষণ হল।

– সব ঠিক আছে তো ?

– মানে ?

– ওই আনন্দী আবার কোনো ঝামেলা পাকায়নি তো ?

– না না একেবারেই নয়।

– যাক বাবা। আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল। আজ অঙ্ক ক্লাসে আসছিস তো ?

– হ্যাঁ, যাবো।

– ঠিক আছে। তাহলে তখনই কথা হবে। এখন ছাড়ছি।

দরজা খুলে সামনে রঘুকে দেখে জিতেন দাস অবাক হয়ে বলল – 'রঘু, এই সময়ে তুই এখানে ? সব কিছু ঠিক আছে তো ?'

রঘু তাকে আশ্বস্ত করে – 'সব ঠিক আছে দাদু। দিদিমার শরীরটা ভালো নেই শুনে ভাবলাম কোচিং ক্লাস থেকে ফেরার পথে একবার দেখা করে যাই।'

রমলা চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়েছিল, কিন্তু ঘুমোয়নি। রঘুর ডাকে চোখ খুলে তাকাল। ঠোঁটের কোনে একটু হাসি ফুটে উঠল। ঈশারায় তাকে কাছে এসে বসতে বলল। রঘু এগিয়ে গিয়ে বিছানার পাশে রাখা টুলটায় বসল। রোগা হাতটা রঘুর পিঠে রেখে রমলা বলল – 'অনেক দিন পর এলি! কেমন আছিস ?'

অপরাধী মুখ করে রঘু বলল – 'দোকান আর পড়াশোনা সামলে আসতেই পারি না দিদিমা। কতবার আসব ভাবি, কিন্তু সময়ই হয় না। এখন কেমন আছ তুমি ?'

ম্লান হেসে রমলা মাথা হেলাল – 'ঠিকই আছি!'

টুলে বসে রমলার দিকে তাকিয়ে রঘু ভাবছিল, মানুষটা অনেক রোগা হয়ে গেছে, মুখ চোখও বসে গেছে। রঘু জিজ্ঞাসা করল – 'রাতের খাওয়া হয়েছে, দিদিমা ?'

– 'আমার খাওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু তোর দাদু এখনো খায়নি।' এটুকু কথা বলতেই রমলা যেন হাঁপিয়ে গেল।

পাশের ঘর থেকে জিতেন বলল – তোর সাথে একটু কথা আছে, রঘু।'

রঘু পাশের ঘরে এসে জিতেন দাসের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল। রঘুর দিকে তাকিয়ে জিতেন বলল – 'সকালের কথা সব শুনেছিস ?'

– 'সুজন সাহাদের কথা তো ?'

– 'হ্যাঁ, ওদের কথা। তবে ওরা তো আর নিজের থেকে কিছু করছে না। পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে ঝুনঝুনওয়ালা আর ওর ম্যানেজার মিহির দত্ত। চা-ঘর ওরা উঠিয়ে দিতে চাইছে !'

– 'উঠিয়ে দিলেই হল ?' রঘুর রাগ মুখে চোখে ফুটে ওঠে। 'এতদিনের পুরনো একটা দোকান !'

একটু হেসে রঘুকে শান্ত করে জিতেন বলে – 'চটে গিয়ে লাভ নেই রঘু। ঠান্ডা মাথায় ব্যবস্থা একটা নিতে হবে। আমিও এত সহজে হার মানার পাত্র নই। তবে কি জানিস, কানাঘুষায় আমি শুনেছি ইদানীং কালে দোকানে কিছু উল্টো পাল্টা কাজ হয়েছে। আর দত্ত তো ঘাঘু লোক। ও সেটাকেই কাজে লাগাতে চাইছে।'

শেষের কথাটা শুনে রঘু একটু ঘাবড়ে গেল। জিতেনের কথার সঠিক অর্থ বোঝার জন্য সে তার দাদুর দিকে তাকিয়ে রইল। একটু থেমে জিতেনই আবার বলল – 'আমি জানি তুই সে সবের মধ্যে ছিলি না। আসলে তুই যখন পরীক্ষার সময় বীরেশ্বর মাস্টারের বাড়িতে ছিলি, শুনেছি তখন রাতে চা-ঘরে জুয়ার আড্ডা বসত। এখন এসব যদি জানাজানি হয় তো আমরা বিপদে পড়ে যাব। স্থানীয় লোকজনও এটা সাপোর্ট করবে না। আর পুলিশও পিছন লেগে যাবে।'

ফ্যাকাসে মুখ করে রঘু বলল – 'তাহলে কি হবে দাদু ?'

চিন্তিতভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে জিতেন বলল – 'হুম, ভাবছি। দ্যাখ, ঝুনঝুনওয়ালার ক্ষমতা সবদিক দিয়েই আমাদের থেকে অনেক বেশি। কিন্তু আমিও তো এই কালিচকের পুরনো লোক। এখানকার দশ বিশটা মানুষ আমাকেও

অনেক দিন ধরে চেনে। আমি থানার বড়বাবুর সাথে কথা বলেছি। উনি আমাকে ভরোসা দিয়েছেন। আমাদের দোকানের উল্টো দিকে মোড়ের মাথায় অনেক দিন ধরে একটা পুলিশ পোস্ট বসানোর কথা হচ্ছে। ওটা যাতে এবার তাড়াতাড়ি হয়ে যায় সেটা দেখবেন বললেন। আর থানা তো চা-ঘর থেকে বেশি দূরে নয়, নজর রাখবেন বললেন। দেখা যাক!'

রঘু উৎসাহিত হয়ে নড়েচড়ে বসে বলল – 'ব্যাস তাহলে তো হয়েই গেল। পুলিশ নজর রাখছে জানলে চা-ঘরে কেউ আর জুয়ার আসর বসাতে সাহসই পাবে না। আর গুন্ডা বদমাসরাও একটু সমঝে চলবে।'

ভিতরের ঘর থেকে রমলা দুর্বল স্বরে বলল – 'রাত হয়ে যাচ্ছে। ছেলেটাকে ছেড়ে দাও। তুমি খেয়ে নাও।'

জিতেন দাস বিরক্তস্বরে বলল – 'আহা, তুমি আবার এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন ? তোমার তো খাওয়া হয়ে গেছে। চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়।' এরপর সে রঘুর দিকে ফিরে বলল – 'কদিন ধরেই তোর সাথে আলাদা করে একটু কথা বলব ভাবছিলাম। ভালো হয়েছে যে তুই এসেছিস! শোন্, দোকানের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। আমি আজকাল নিয়মিত যেতে পারি না। তুইও পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত। দোকানে সময় দিতে পারছিস না। আমি বুঝতে পারছি যে টাকা পয়সা নয়-ছয় হচ্ছে। ওদিকে আবার দোকান উঠিয়ে দেবার জন্য কে যে কাকে হাত করছে তাও জানি না ! এদিকে আবার তোর দিদিমার চিকিৎসার খরচ। সব মিলিয়ে আমি খুব ঝামেলার মধ্যে রয়েছি। কিন্তু তোকে যেটা বলতে চাইছি, সেটা হলো তুই যেহেতু এখন দোকানের কাজ তেমন করতে পারছিস না, তোকে আমি কাজের জন্য যে টাকাটা দিতাম, সামনের মাস থেকে সেটা আর দিতে পারব না। এখানে আমার যে ভাইপো আছে, সে মাস মাইনেতে বিকেলে দোকানে কাজ করতে রাজী হয়েছে ! তুই সকালটা সামলে দিস, বিকেলে ও রোজ দোকানে আসবে ! মানে, তুই চা-ঘরে যেমন আছিস, সে রকমই থাক, খাওয়া দাওয়া কর, আর তার বদলে এখন যতটুকু কাজ করছিস, ততটুকুই কর। শুধু মাইনেটা পাবি না। যখন আবার দোকানে সময় দিতে পারবি, তখন আবার টাকা পাবি।'

রঘু একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। ওর মুখ শুকিয়ে গেল। জিতেন দাসের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল – 'মাইনে পাব না ? তাহলে টিউশন ফি, পরীক্ষার ফি ? আর ক'মাস বাদেই তো পরীক্ষা !' রঘু যেন অথৈ জলে পড়ে গেল।

একটু রাগতস্বরে জিতেন বলল – 'কিন্তু আমিই বা কি করি, বল ? আমাকেও তো ব্যবসা করে খেতে হয় ! আর তাছাড়া বিনা কাজে তোকে যদি মাইনে দিই তবে তো অন্যরাও গোলমাল করবে। তাই না ? ইতিমধ্যেই ওরা অনেক কথা বলতে শুরু করেছে।'

– 'ওরা অনেক কথা বলছে ? কারা, কি বলছে দাদু ?' রঘু খুব আস্তে ধীরে প্রশ্ন করে।

– 'ওসব জেনে তোর কি হবে ? তুই বরং এক কাজ কর। তোর জমানো টাকা গুলো এই সময় কাজে লাগা। এই জন্যই তো তোকে অ্যাকাউন্টটা খুলে দিয়েছিলাম। পরীক্ষা দিয়ে তারপর আবার না হয় কাজে যোগ দিস।'

রঘু পরিস্থিতি বুঝবার চেষ্টা করে, নিজেকে সামলে নিয়ে বলে – 'হ্যাঁ, দেখি। ব্যবস্থা তো একটা করতেই হবে। এখন চলি দাদু।'

– 'সাবধানে যাস।' জিতেন বলল।

কদিন ধরে রঘুর মুখ শুকনো, সবসময় অন্যমনস্ক ভাব ! অঙ্কিত জিজ্ঞাসা করল – 'কি হয়েছে রে তোর ?' রঘু অঙ্কিতকে সব কথা বলতেই সে রেগে মেগে চেঁচিয়ে উঠল – 'এ কি রকম অন্যায় কথা ! তোর দাদু এটা করতে পারল ? জানে আর ক'মাস বাদেই তোর পরীক্ষা !'

রঘু বন্ধুকে শান্ত করে বলল – 'প্রথমে আমিও ওনার উপর খুব রেগে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরে ঠান্ডা মাথায় ভাবলাম – উনি তো কিছু অন্যায়ে বলেননি। দাদুকে তো সবদিক দেখতে হবে।'

– 'কিন্তু তুই এখন কি করবি ?' অধৈর্য্য ভাবে অঙ্কিত বলল, আর যাই করিস রঘু, এতদূর এগিয়ে এসে পরীক্ষাটা যেন বাতিল করিস না !'

– 'না না, সে প্রশ্নই ওঠে না। আমার কিছু জমানো টাকা আছে। তাই দিয়ে ম্যানেজ করতে হবে। তবে ইংলিশ কোচিং বোধহয় বন্ধ করতে হবে। যা আছে, তাতে এত কিছু হবে না। ইংরেজিটা তুই পড়াতে পারবি না ?' অঙ্কিতের দিকে তাকিয়ে হেসে প্রশ্ন করল রঘু।

– 'বাজে কথা বলিস না তো ! টিচারের পড়ানো আর আমার পড়ানো কি এক ? এখনো কোর্স শেষ হয়নি। তুই এখনই কোচিং বন্ধ করিস না !'

আজকাল বিকেল পাঁচটা না বাজতেই জিতেন দাসের ভাইপো চা-ঘরে চলে আসে। ততক্ষণে একজন দুজন করে খরিদ্দার আসা শুরু হয়ে যায়। রঘু ইদানীং সাড়ে চারটে বাজলেই বইপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কোচিং ক্লাস ছ'টার আগে শুরু হয় না। তাই রঘু তেকোনা পার্কের বেঞ্চে বসে পড়াশোনা করে। ওই সময় ওখানে সাধারণত কয়েকটা কুকুর ছাড়া আর কেউ থাকে না। মাঝে মধ্যে এক জন বুড়ো মানুষ একটা বেঞ্চ দখল করে শুয়ে থাকে। তাতে রঘুর কোনো অসুবিধা হয় না।

ওই পার্কের নিরিবিলিতে পড়তে বসে রঘুর মধ্যে একই সাথে অদ্ভুত একটা বিষণ্ণতা আর মুক্তির আনন্দ ছড়িয়ে যেতে থাকে। কদিন বাদে অঙ্কিতও যোগ দিল ওর সাথে। বলল – 'এই বেশ ভালো হল ! কেউ ডিসটার্ব করবে না। আমরা দুজন নিশ্চিন্তে পড়াশোনা করব। একেবারে শান্তিনিকেতন !'

– 'ভাগ্যিস, বর্ষা কাল পেরিয়ে গেছে।' হেসে যোগ করল রঘু।

দিব্যি চলছিল। কিন্তু একদিন ওই পার্কের পাশের রাস্তা দিয়ে গাড়িতে যাবার সময় আনন্দী ওদের দেখে ফেলল। নিমরাজি ড্রাইভারকে বলে কয়ে গাড়ি থেকে নেমে পুরো ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বলল – 'এটা তো দারুণ আইডিয়া। আমিও কাল থেকে পূজাকে সঙ্গে নিয়ে এসে এখানে বসে পড়াশোনা করব।'

আপত্তি জানিয়ে অঙ্কিত বলল – 'কেন ? তোমরা কেন আসবে ? তোমরা বড়লোক মানুষ। তোমাদের তো আর বাড়িতে বসে পড়াশোনা করার কোনো অসুবিধা নেই। আমরা এখানে একটু শান্তিতে পড়াশোনা করব বলে আসি, সেখানেও তোমরা ডিসটার্ব করতে আসবে ?'

আনন্দীও কম যায় না। রঘুর দিকে ফিরে বলল – 'তোর বন্ধুটা এত হিংসুটে কেন রে ? আমরা এখানে পড়তে আসব তাতে তোদের কি ? এতবড় জায়গা, কারো ঘাড়ে ঘাড়ে বসার তো দরকার নেই।' এবার অঙ্কিতের দিকে ফিরে বলল – 'আর শোনো, সারাক্ষণ অত গরীব বড়লোক কোরোনা তো ! পার্কে কোথাও লেখা আছে যে, এখানে বড়লোকরা আসতে পারবে না ?'

মাসখানেকের মধ্যে পাঁচ ছয়জনের একটা গ্রুপ তৈরী হয়ে গেল। ওরা মিলে মিশে পড়াশোনা করে, ঝগড়াও করে, আবার মাঝে মাঝে আড্ডাও দেয়। আনন্দী কেক, স্যাণ্ডুইচ আনে, পূজা ফ্লাস্কে করে চা/কফি আনে, অঙ্কিত ওর মায়ের হাতে মাখা মুড়ি চানাচুর নিয়ে আসে। সবাই ভাগ করে খায়।

প্রিবোর্ডের সময় এসে গেল। রঘু মুখ শুকনো করে অঙ্কিতকে বলল – 'টাকা আর বেশি নেই। কি করব ভাবছি !'

অঙ্কিত চোখ বড় করে বলল – 'সেকিরে, সব শেষ হয়ে গেল ?'

– 'আসলে, মাইনে পাবোনা – এটা আগে জানতাম না তো ! টুয়েলভে ওঠার পর মোবাইল কিনলাম। চৈত্র সেলে জামা কাপড় কিনলাম। আগেরগুলো একদম ছোট হয়ে গিয়েছিল। অনেক টাকা খরচ হল!' রঘু অপরাধী মুখ করে তাকায় অঙ্কিতের দিকে।

অঙ্কিত আশ্বাস দিয়ে বলে – 'এত চিন্তা করিস না – ব্যবস্থা একটা ঠিক হবে।'

(চলবে)

রমা জোয়ারদার – দিল্লীর বাংলা সাহিত্য মহলে একটি পরিচিত নাম। গত কুড়ি বছর ধরে দিল্লী, পশ্চিমবাংলা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। প্রকাশিত ছোট গল্প সংকলন ঃ (১) রোজ নামচার ছেঁড়াপাতা; (২) সবুজ ঢেউ আর ঝাপসা চাঁদ।

ধারাবাহিক

সৌমিত্র চক্রবর্তী

সময়

পর্ব ১৩

এ' পৃথিবীতে একজন মানুষ কেন কোনও কিছু চায়, সেটা সে বোধহয় নিজেও বুঝে উঠতে পারে না। আসলে, মানুষের চাওয়ার মধ্যেও একটা শৃংখলা থাকা উচিৎ, সমধর্মীতা থাকা উচিৎ। চাহিদাগুলোর চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলে মানুষের পক্ষ্যে পরে সবদিকে তাল রাখা সমস্যার হয়ে দাঁড়ায়। বেশ কিছু মানুষ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এটা করতে পারলেও, বেশীর ভাগই সেটা পারেনা। যেমন তথাগত পারছে না। খেই হারিয়ে ফেলছে।

শীত আসতে শুরু করবে এবার। এখন ভোরবেলা গুলো হিমেল হয়ে উঠে জানিয়ে দিচ্ছে সে খবর। হেমন্তের সন্ধ্যাগুলো বড় প্রিয় তথাগতর। এইসব সন্ধ্যায় সুযোগ পেলে ছাদে চলে যায় সে। একটা শীতলভাব থাকে আকাশের বুক জুড়ে, মানুষ তাকে বলে হিম পড়া। ফ্ল্যাটবাড়ি হয়ে যাওয়ার দাপট এড়িয়ে এখনও যেসমস্ত বাড়ি শুধুই বাড়ি হয়ে থাকতে পেরেছে, তাদের কারও কারও ছাদে আকাশ প্রদীপ জ্বলতে দেখা যায়, মানুষের ধারণা এতে পূর্বপুরুষদের পথ দেখানো হয়। এ'সব মানে না তথাগত। মানুষের দেহ তো আদতে জৈব প্রক্রিয়ায় তৈরী হওয়া একটি যন্ত্র মাত্র। সে যন্ত্রের কাজ শেষ হয়ে গেলে; তার আর কিই বা পড়ে থাকে তাকে স্বর্গ পথ দেখানোর জন্য বাড়ির মাথায় আলো লাগাতে হবে ? আসলে মানুষ যেহেতু জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় কল্পনাপ্রবণ, তাই সেই কল্পনায় ভর করে মানুষ তার পৃথিবীতে আসা-যাওয়াকে মহিমান্বিত করতে চায়। এই যে কোনও সন্তানের জন্ম দিয়ে মা, বাবা ভাবেন যে সেই সন্তান তাঁদের ভালোবাসার ফসল, সত্যিই কি তাই ? যৌন সংগম মানুষ নিছক জৈবিক তাড়নাতেই তো মূলত ঃ করে। আর যদি সত্যি সত্যিই সেই সংগমের গোড়াটা ভালোবাসা দিয়ে শুরুও হয়, চূড়ান্ত মুহূর্তে কাম ছাড়া আর কিছু থাকে কি ? আঁচরানো, কামড়ানো, খিমচোনো — এ'সব মানুষ ভালোবাসার মানুষকে করে কি ? এ তো কামেরই বহিঃপ্রকাশ। আসলে, মানুষ তার পশুত্বকে ঢেকে রাখতে চায়। বোঝেনা, পশুত্বেই লুকিয়ে আছে জীবনের সবচেয়ে বড়ো স্বাভাবিকতা।

তথাগত-র ভাবনায় অবশ্য এ'গুলো এখন প্রাধান্য পাওয়ার কথা নয়। সত্যি বলতে কি, তথাগত একটু সমস্যায় আছে। প্রায় মাস তিনেক হল পূজার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে তার। এতদিন প্রেম করছিলো, অতোটা বোঝেনি, কিন্তু এখন যতদিন যাচ্ছে, তথাগতের চোখের সামনে তাদের মানসিকতার অমিলটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিয়ের আগে সে বোঝেনি, তা নয়, তবে তখন চোখে প্রেমের মায়াকাজল পরানো ছিল, তাতে পৃথিবীটা অনাবশ্যক রঙিন লাগতে থাকে, আর তাছাড়া তথাগত ভেবেছিলো বিয়ের পর একটা মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপার এসেই যাবে। সে বোঝেনি। আসলে, পূজা যে তার সঙ্গে তার পছন্দমতো জায়গাগুলোতে যেতো, পছন্দমতো আলোচনায় যথাসম্ভব অংশগ্রহণ করত, সেটাও যে ওই মায়াকাজলেরই প্রভাব, তা বোধহয়, সে কেন, পূজা নিজেও সম্যকভাবে বোঝেনি। পূজা বস্তুতন্ত্রে ঘোরতর বিশ্বাসী, আর পাঁচটা গড়পড়তা মানুষের মতোই পূজার ভালো থাকার, ভালো জীবনযাপনের সজ্ঞাটা তথাগতর থেকে বেশ কিছুটা আলাদা। পূজার ভালো থাকা শপিংমলে, পূজার ভালো থাকা রেস্তঁরায়, পূজার ভালো থাকা এ.সি. চালিয়ে LED তে বিদেশী মুভিতে। তথাগতর ভালো থাকা গুলোর সঙ্গে এগুলোর সহস্রযোজন তফাৎ। তথাগত জানে যে ভালো লাগাগুলো একটু অন্যরকমের, কিন্তু কি করবে সে ? এ'গুলো তো তারই ভালো লাগা, এই ভালো লাগাগুলোকে সে অত্যন্ত স্নেহ করে, প্রশ্রয় দেয়।

এই হনিমুন নিয়েই যা হল। পূজার ইচ্ছা ছিলো সিমলার দিকটা যাওয়ার। তথাগত জানে যে ওইদিকটা সত্যিই ভারী সুন্দর, কিন্তু তথাগত ভেবে রেখেছিলো একটু অন্যরকমের হনিমুনের কথা। সে ভেবেছিলো যে তারা জঙ্গলমহলে গিয়ে কাটাবে সাতদিন, আদিবাসী মানুষগুলোর সঙ্গে। আসলে, এটায় দুটো জিনিস করতে চেয়েছিলো সে। প্রথমতঃ তার মনে হয়েছিলো যে হনিমুনে গিয়ে নিজেদের সত্যিকারের একটা প্রাকৃতিক পরিবেশ উপহার দিতে চেয়েছিলো সে। সাজানো-

গুছোনো নয়, একদম যা তাই । আর দ্বিতীয়তঃ, জঙ্গলমহলে গিয়ে কাজ করবার যে পরিকল্পনা তার আছে, সে বিষয়ে একটা বাস্তবিক রূপরেখা সে পূজাকে দিতে চেয়েছিলো । তথাগত চেয়েছিলো যে পূজা দেখুক ভবিষ্যতে তথাগত কি করতে চলেছে । জীবনসঙ্গিনী হিসাবে এটা জানা পূজার অধিকারের মধ্যে পড়ে, ভেবেছিলো সে এবং তার কর্তব্যও । কিন্তু পূজা চরমভাবে বেঁকে বসল এবং একপ্রস্থ অশান্তির পরে সিমলাই যাওয়া হল । কিন্তু তথাগত মনে মনে ভেবে নিয়েছে যে জঙ্গলমহল সে যাবেই, নিজেকে মিশিয়ে দেবে ওখানকার সঙ্গে ।

সেদিন শিঞ্জিনিদির সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে কফিহাউসে বসেছিলো তারা । কফিহাউস জায়গাটা পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্য জায়গা বলে মনে করে তথাগত । মানুষ চিরকাল ভেবে এসেছে যে শিল্প সাহিত্য সৃষ্টির জন্য নীরবতা একান্ত বাঞ্ছনীয় । প্রবল শব্দ সৃষ্টির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে । কিন্তু এই সদ্য মুখরিত কফিহাউস সেই ধারণাকে যেন দুমড়ে মুচড়ে দেয় । এত শব্দের অনুরণনের মধ্যেও বাংলা সাহিত্যের কি সব ফুল ফুটে গেছে যুগে যুগে এই কফিহাউসেই ।

-''তথাগত, আসলে আমি তোমার জঙ্গলমহল যাওয়াটা একদম চাইছিনা'' — শিঞ্জিনিদিই প্রসঙ্গটা শুরু করেছিল কোণের টেবিলটায় বসে,'' দ্যাখো তুমি তো সবে বিয়ে করেছো পূজাকে । পূজাকে পূজার প্রেক্ষাপটকে ভালোমতই চেনো তুমি । তুমি নিশ্চয় বোঝো, পূজা কিছুতেই তোমার জঙ্গলমহল যাওয়াটা সমর্থন করবেনা । ও এই গোত্রের মানুষ নয়, তথাগত । পূজা তোমার উদ্দেশ্যটা ঠিকমত নিতেই পারবেনা ।''

— ''দেখুন, শিঞ্জিনিদি, পূজা যা ভালোবাসে, আমি ভালোবাসিনা । কাজেই আমি ভাবতে পারিনা যে আমি যা করতে ভালোবাসব, পূজাও সেটা পছন্দ করবে । মূল কথাটা হল যে আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি কিনা । যদি বাসি, তবে পরস্পরের ইচ্ছা কে এতটুকু স্পেস তো আমাদের দেওয়াই উচিৎ ।'' তথাগত খোলামেলা হয়েছিলো ।

— ''হ্যাঁ, তথাগত, যুক্তি হিসাবে তোমার কথা আমি মানি, কিন্তু পূজা নাও মানতে পারে । মনে রেখো, এ পৃথিবীতে বেশীর ভাগ মানুষই ভালোবাসা বলতে বোঝে দেওয়া আর নেওয়া, তার বেশী কিছু নয়''।

কিছুক্ষণ চুপ করেছিলো তথাগত, তারপর খুব ধীরে ধীরে, প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলো, ''শিঞ্জিনিদি আমি যেতে চাই'' ।

কিছুটা সময় চুপ করেছিলো শিঞ্জিনিদিও, খুব সম্ভবতঃ ভাবতে সময় নিচ্ছিলো, তারপর তথাগত-র চোখে চোখ রেখে বলেছিল, ''বেশ, তুমি যেও । জঙ্গলমহলের তোমার মতো মানুষের প্রয়োজন আছে । শুধু জেনে যেও, জীবনের কিছু কিছু পথ থাকে, যে পথে হেঁটে গেলে ফেরবার রাস্তা নাও পাওয়া যেতে পারে ।''

সেদিন সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়েছিলো, আজ তথাগত মনে মনে আবার বলল, ''আমি যাবো, সব জানি, তবু, আমি যাবো''।

স্থির চোখে নীলদার চলে যাওয়াটা দেখল শীর্ষ । নীলদা কিন্তু এখনো চেহারাটা চমৎকার রেখেছে । শীর্ষেন্দু । তার নাম শীর্ষেন্দু মিত্র — শীর্ষ ভুলেই গিয়েছিলো, আজ নীলদা শীর্ষেন্দু বলে ডাকতে পুরোনো নামটা ফেরত পাওয়া গেল হঠাৎ । নীলদা এখন আর এখানে থাকে না, আজ কি করতে এসেছিলো, কে জানে । শীর্ষ সেটা জিজ্ঞাসা করতেই ভুলে গেল । দেবুদার দোকানটা যে শীর্ষের ঠেক-কাম-অফিস, নীলদার জানার কথা নয়, পথচলতি তাকে দেখতে পেয়েই দাঁড়িয়েছিলো নীলদা, তারপরই ঐ শীর্ষেন্দু ডাক । শীর্ষ প্রথমটায় ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলো । এখন তো তার অন্যসব নাম — গুরু, বস, ওস্তাদ, শীর্ষদা । মালাইকা অরোরার বুক আর কোমর থেকে চোখ তুলতেই দেখতে পেয়েছিলো নীলদাকে ।

নীলদা তারই স্কুলের ছেলে । চার-পাঁচ বছরের সিনিয়ার বোধহয় । বয়সে অনেক ছোট হলেও শীর্ষকে খুব স্নেহ করত নীলদা । শীর্ষকে খুব সুন্দর দেখতে ছিলো তো তখন, এখনকার মতো চোখ ঢোকা, গাল ভাঙ্গা ফেস তো সে নয় সেই সময়ে । তখন সে বিখ্যাত মিত্র বাড়ির ন'ছেলের একমাত্র সন্তান । শীর্ষর বাবা-কাকার । তখন সারাদিন ভীষণ ব্যস্ত তাদের ব্যবসাপাতি নিয়ে । বিরাট করে দুর্গাপূজা হত শীর্ষদের বাড়ি, আজও হয়, শীর্ষ আর থাকেনা তেমন তাতে । এখন আর

কিছুই তেমন ভালো লাগেনা শীর্ষর, এই দেবুদার দোকান ছাড়া । নীলদা আসত তাদের বাড়ির দুর্গাপূজা দেখতে, থাকত অনেকক্ষণ । শীর্ষরও খুব ভালো লাগত নীলদাকে, আজও লাগে । লোকটা এখন অনেক বড় চাকরি করে বলে শুনেছে সে, কিন্তু এই তো আজ কেমন সুন্দর করে কথা বলল, আবার নিজের একটা কার্ড দিয়ে একদিন শীর্ষকে তার বাড়ি যেতে বলল, ভালো করে বুঝিয়ে দিলো ঠিকানাটা । এখন তো পাড়ার সব ভদ্দরলোকেরা তার সঙ্গে ভালো করে আর কথাই বলেনা, বললেও হয়, ঘৃণায় বা ভয়ে বা একান্ত বাধ্য হয়ে । ভাবটা এমন, শীর্ষর সঙ্গে কথা বললেই যেন মামা ধরে নিয়ে যাবে । আবার কথা বলবার স্টাইল কি । ''বাবা শীর্ষ ।'' শালা, যেন ছোটবেলায় কোলে করে বুকের দুধ খাইয়েছে । শীর্ষ সব বোঝে । মুখে ''বাবা শীর্ষ ।'' আর মনে মুরলীর উপচে পড়া ভ্যাট গাড়ির মতো ঘেন্না । কেন ? শীর্ষর সঙ্গে ভালো করে কথা বললে কি হয় ? হারামিদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স কমে যায় ? এই মাল গুলোই তার ছোটবেলায় মিত্তিরবাড়িতে নেমন্তন্ন পাওয়ার আহ্লাদে আটখানা হয়ে তাকে নিয়ে কতো আদিখ্যেতাই করত । এই তো নীলদা, কথা বলে গেল, কই ? তার গলা শুনেই তো শীর্ষ ঠিক বুঝে গেল মনে মুখে এক । নীলদা লোকটা এখনও ভালো । শীর্ষর মা ছোটবেলায় বলত, ''খোকা, নীলের মতো হ ।'' মা বলত বটে, কিন্তু সত্যিই কি নীলদার মতো হতে পারত শীর্ষ ? হওয়ার কোনও ইচ্ছা আদৌ ছিলো কি তার ? ছোটবেলা থেকেই কেন জানেনা, দাপট ব্যাপারটা ভীষণ পছন্দ ছিল শীর্ষর । শীর্ষ যখন ছোট, তখনও তো দেবুদা ওঠেনি, পাড়ার এক নম্বর মস্তান ছিল ভানুদা । ভানুদা যখন বাইক ভটভটিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে চলে যেতো, শীর্ষ জানালায় ছুটে চলে আসত । ভাবত, কবে সে ওইভাবে যাবে । দেখতো তো, তার বাবা-কাকারাও ভানুদাকে কেমন সমঝে চলত । ওই সেই 'বাবা ভাতু' কেস । তখন দেবুদাও উঠছে সবে । টুকটাক দাপট দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু পায়ের তলার জমিটা শক্ত করে উঠতে পারছেনা , শীর্ষর মন এ'সবে ছিলো বটে, কিন্তু তখনও পড়াশুনা জিনিসটার সঙ্গে একটা সম্পর্ক রেখে চলত সে, খানিকটা ভদ্রতা করেই বোধহয় । ঝাঁমেলাটা বাঁধল ক্লাস ইলেভেনে । রুমকিকে যে সে ভীষণ পছন্দ করে, সেটা সারা ক্লাস জানতো, রুমকি তো জানতই । মাধ্যমিকের পরেই তো শ্যাম পার্কে সন্ধ্যাবেলায় রুমকিকে চুমু খেয়েছিল সে, আচ্ছাসে বুক কচলে দিয়েছিলো । রুমকি কিচ্ছু বলেনি । গন্ডগোল পাকালো অরিন্দম । সেই ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে পড়ছে, কোথাও কিছু নেই, ক্লাস ইলেভেনে উঠে শুয়োরটা রুমকির প্রেমে পড়ে গেল । রুমকিকে লম্বা লম্বা চিঠি লিখতো, কত সব কথা বলত । অমন কাব্যির কথা শীর্ষকে দু'পাঁইট খাওয়ালেও বেরোবেনা ।

শীর্ষ বোঝাতে গিয়েছিল অরিন্দমকে, ব্যাটা বলে কিনা, রুমকিকে আমি উদ্ধার করব, কোথা থেকে উদ্ধার করবিরে হারামি ? কেন, রুমকি কি দাউদের আস্তানায় বন্দী আছে ? আর রুমকি তখন নিয়মিত তুলে দিচ্ছে নিজেকে শীর্ষর হাতে । শীর্ষ দেখলো, মালটাকে ক্যালান খাওয়াতে হবে । দেবুদা চিনতো তাকে, সে দেবুদার আশ-পাশে ছুঁকছুঁক করতে কিনা । দেবুদা প্রশ্রয় দিতো তাকে খানিকটা, বোধহয় বুঝত শীর্ষর ভবিষ্যতটা । তো দেবুদার সঙ্গে সব কথা হয়ে গেলো । বুধবার রাতে রুমকির অশোক স্যারের থেকে ফেরার রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতো অরিন্দম । সেই বুধবার অরিন্দমকে তুলে নিয়ে গেলো দেবুদার ছেলেরা আর রুমকিকে শীর্ষ । ছেলেগুলো অরিন্দমকে রামক্যালান কেলিয়ে ফেলে দিলো মাঠের ধারে আর শীর্ষ মন্দিরে গিয়ে সোজা বিয়ে করে ফেললো রুমকিকে । সে কি হাঙ্গামা বাড়িতে । বাবা, কাকারা রেগে বোম, মা-কাকীমাদের টানা কান্নাকাটি, বহুত বাওয়াল । কিন্তু শীর্ষ হিসাবটা বুঝত সে বয়সেই । সে জানত কেচ্ছা ঢাকতে রুমকিকে ঘরে তুলে নেবে মিত্তির বাড়ি । ঠিক তাই হল । শীর্ষর সঙ্গে বাবার কথা-বার্তা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল বটে, কিন্তু রুমকি বাড়িতে জায়গা পেয়ে গেল । এদিকে অরিন্দমটা আবার চোখ মেলে শীর্ষর নামটা বলে দিল । ওর বাপ হারাধন বোস ছিল আবার উকিল । সে তো কেস করব ফেস করব বলে খুব লাফালো শীর্ষদের বাড়ি এসে । বাবা কাকারা তটস্থ হয়ে গেল । শীর্ষকে যা তা বলতে লাগল । শীর্ষ তো মনে মনে হেসে আকুল । কেস করবে । প্রমাণ টা কোথায় ? কথাটা একদিন হারু বোসকে বেশী লাফাতে দেখে বলেই ফেলল সে । ব্যস, হারু বোসের কপচপানি ওখানেই খতম । সেই থেকে বাপ-ব্যাটা আজ পর্যন্ত আর কথা বলেনি শীর্ষর সঙ্গে, দেখলেই সুড়সুড়িয়ে কেটে পড়ে । এই সুযোগে স্কুল যাওয়াটাও ছেড়ে দিল শীর্ষ এত বাওয়ালের পরে ওই স্কুলে আর যাওয়া যায় না কি ? ওই স্কুল কেন, কোনও স্কুলেই আর গেলনা শীর্ষ । সোজা ভিড়ে গেল দেবুদার সঙ্গে । মিত্তির বাড়িতে সব ছিলো – ব্যবসাদার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শীর্ষ মিত্তির বাড়িকে একটা মস্তান উপহার দিলো । থাকা ভালো, সব রকমই থাকা ভালো, ভাবতে ভাবতে এতদিন পরেও হেসে ফেললো শীর্ষ ।

দিন যেতে যেতে কখন যে দেবুদার ডান হাত বাঁহাত সব হয়ে উঠল সে, শীর্ষ নিজেও ভালো করে জানে না। তবে হ্যাঁ, তার ছোটবেলার স্বপ্ন সফল হয়েছে। তার দাপটে কাঁপে পাড়া। থানায় গেলে মেজবাবু চেয়ার এগিয়ে দেয়। বড়বাবু ''শীর্ষবাবু বলে ডাকে। দেবুদা তো এখন সব তার উপরই ছেড়ে দিয়েছে। আর এই এক জিনিস তৈরী করেছে ভগবান — প্রমোটিং। লাল হয়ে গেল শীর্ষ চুন বালি, সিমেন্ট দিতে দিতে। কি ঢপের ব্যবসা করে তার বাপ কাকা, শীর্ষ তার চেয়ে বেশী কামায়। তবে এখন একটা খুচরো অশান্তি শুরু হয়েছে। বাপটুটা খুব উঠছে। বাপটুর হারামিপানার হাতেখড়ি হয়েছিল দেবুদার কাছেই — কিন্তু শীর্ষর দাপটে পাত্তা না পেয়ে অন্য দল গড়ে কামড় বসানোর চেষ্টা করছে। শীর্ষর উপরই ক্ষারটা বেশী। পাড়ার কেউ কেউ ভাবছে এবার বাপটুর জমানা। ভুল। শীর্ষ জানে, পাড়ায় দাপট দেখানোর ভাষাটা কি। এইবার দুর্গাপুজোটা খুব বড় করে করতে হবে, বলিউডি মাল আনতে হবে, আলো-কালো ঝিনচ্যাক, ব্যস, পাড়া বুঝে যাবে শেরটা কে। তবে অনেক টাকা লাগবে। বাপটুটা থাবা মারতে শুরু করবার পর থেকে আমদানি কমেছে। কুছ পরোয়া নেই। টাকা যোগাড় করে ফেলবে শীর্ষ। এই তো নীলদা ! নীলদা তো বড় চাকরী করে। ওকে ধরা যায়। শীর্ষ ঠিক করল, একদিন নীলদার বাড়ি যাবে।

তথাগত-র বাড়িতে এসে আজ বেশ কুণ্ঠাই হচ্ছিল সোমের। তথা-টা একটা পাগল। আরে সোমকে কেউ কবিতা পাঠ করতে ডাকে এই আসরে ? ঘরে ঢুকেই দেখেছে সোম, অন্ততঃ জনা কুড়ি কমবয়সী ছেলে-মেয়ে এসে হাজির হয়েছে ইতিমধ্যে। এরা সবাই-ই কি কবি নাকি ? বাঃ হলে বেশ হয় কিন্তু। আজকের প্রজন্মের এত ছেলে-মেয়ে বাংলা ভাষাতে কবিতা লিখছে, ভাবলে ভালো লাগে।

''আচ্ছা, আপনি কি সোমদত্ত সেন ? লাজুক গলার প্রশ্নটায় সোমের চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে যায়।

প্রশ্নটা এসেছে যার থেকে, সে একটা বছর বাইশের ছিপছিপে চেহারার মেয়ে। বেশ শ্রদ্ধা মেশানো দৃষ্টিতে সে দেখছে সোমকে।

— ''হ্যাঁ, কিন্তু আপনি আমায় চিনলেন কি করে ? আমি কিন্তু আপনাকে ঠিক place করতে পারছিনা'', সোম একটু অবাকই হয়।

— ''আমাকে তুমি বলবেন please। আপনি আমায় চিনবেন না। আসলে আমার বাবা আপনাদের কোম্পানির একজন ফোরম্যান। গত বছরের আগের বছর আপনাদের পিকনিক হল ফলতায়, ওখানে বাবার সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম। বিকেলে যে বিচিত্রানুষ্ঠানটা হল, তাতে আপনি নিজের কবিতা পড়েছিলেন একটা। কি সুন্দর কবিতা। খুব ভালো লেখেন আপনি।'' বলতে বলতেই ঘাড় ঘোরায় মেয়েটি, ''এই অমিত, এদিকে শোন''।

ভাসা-ভাসা চোখের লম্বা একটি ছেলে উঠে আসে। ''এই দ্যাখ, ইনিই সোমদত্ত সেন, মনে আছে ওনার কবিতার কথা তোকে বলেছিলাম ?'' ছেলেটিকে মনে করবার অবকাশ দিয়ে সোমকে জানায় মেয়েটি, ''জানেন, ওর নাম অমিতাংশু। ও-ও খুব ভালো কবিতা লেখে'', বলবার সময় মেয়েটির গর্ব চোখ এড়ায় না সোমের।

''বা ! ভালো। তা তোমার প্রিয় কবি কে অমিতাংশু ?'' জানতে ইচ্ছা করে সোমের।

— ''শ্রীজাত। শ্রীজাত-র কবিতা খুব ভালো লাগে আমার, জানেন। অদ্ভুত একটা সফল পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রবণতা আছে ওনার মধ্যে'' — অমিতাংশুর গলায় আবেগ খেলে যায়।

— ''আর তার আগের ? সুনীল, শক্তি, নীরেন্দ্রনাথ — এ'সব পড়োনা ?''

— ''পড়ি, ভালোই লাগে। আসলে ... একটা কথা প্রায়ই ভাবি। বাংলা আধুনিক কবিতার শ্রেষ্ঠ সময় কোনটা বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। মানে, কোন সময়টায় বাংলা আধুনিক কবিতার স্বর্ণযুগ ?''

সোমদত্ত হেসে ফেলে। অমিতাংশুর কাঁধে হাত রাখে। বেশ লাগছে ছেলেটিকে। দু'চোখ ভর্তি স্বপ্ন নিয়ে কত কি-ই যে ভাবতে চাইছে ছেলেটা। ''না অমিতাংশু, অমন করে বিচার করে উঠতে পারবে না তুমি। আসলে, ভালো কবিতা বিচারের কতকগুলো স্তর আছে বলে আমার ধারণা।'', সোম সস্নেহে বলে ওঠে।

— ''মানে ?'' ছেলেটির কৌতূহল বাড়ছে বুঝে সোম আবার শুরু করে,'' দ্যাখো আমার মনে হয়, প্রতিটি যুগের, প্রতিটি সময়ের একটি নিজস্ব দর্শন থাকে। সমাজের মধ্যে যে ভাঙা-গড়া, ওঠা-পড়া-টা চলছে, সে যেমন ভঙ্গিমাতেই হোক না কেন, তার একটা প্রতিফলন স্বাভাবিকভাবেই সেই সময়ের মানুষের উপর পড়ে। এখন, কবি তো আর সমাজের বাইরের কেউ নয়। সেও সমাজেরই একজন। হতে পারে সে হয়তো আর পাঁচজনের থেকে কিছুটা অন্যরকম বলে সমাজের নড়াচড়া কে অন্যতর দৃষ্টিতে দেখতে পায়, কিন্তু শেষ অবধি সেই সময়ের প্রভাবের থেকে তো আর সে মুক্ত নয়। কাজেই ধরা যেতে পারে, একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা নির্দিষ্ট সমাজে সব কবিদের উপরই সেই সময়ে ঘটে যাওয়া বা ঘটতে চাওয়া ঘটনাপ্রবাহ ও মননশীলতা প্রভাব ফেলছে। সৃষ্টি — সে যে রূপেই হোক, তো একটা নির্দিষ্ট সময়ের, মানে যে সময়ে সে সৃষ্ট হচ্ছে, কথা আর চিন্তা প্রতিফলিত করতে চায়। কাজেই, সেই সময়ের সমস্ত কবিরাই সেই সময়ের সমাজের, মনের ইতিকথাকে ধরতে চাইবেন। বিচারের বিষয়টা হল সে কাজটা কে কতটা ভালোভাবে পারছেন, শিল্পসম্মত ভাবে পারছেন, কতটা সফলভাবে পাঠককে তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে আইডেন্টিফাই করাতে পারছেন। সে কাজটা যিনি যত সুচারুভাবে পারছেন, তিনি সেই সময়ের তত সফল কবি। তুমি তো আর আজ বিদ্যাপতির স্টাইলে কবিতা লিখবেনা বা রবীন্দ্রনাথের ছাঁদেও। সেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিক্ষিপ্তভাবে করা যেতে পারে, কিন্তু দিনের শেষে পাঠকের দরবারে পরীক্ষাটা দিতে হবে আজকের সময়ের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই।''

সোম থমকে দম নিতেই অমিতাংশু প্রশ্ন ছোঁড়ে, ''তার মানে আপনি বলছেন, কবি বা কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব নিরুপণ করতে হবে তার নিজস্ব সময়ের নিরিখে ?

তাহলে কালোত্তীর্ণ সৃষ্টি বলে কি কিছু নেই ?'' হেসে ফেলে সোম, বলে ''আছে তো। এবার সেই প্রসঙ্গেই আসছি। দ্যাখো অমিতাংশু — এই যে বলছিলাম যে একজন কবি তার নিজস্ব যুগের নিরিখে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবেন। এটা যেমন ঠিক, তেমন এটাও তো ঠিক মানবজীবন ও সমাজের মধ্যে এমন কিছু দর্শন আছে যেগুলো চিরকালীন, শাশ্বত। সে সব জীবন দর্শনের যুগে যুগে হয়তো ফর্ম বদল হয়েছে, কিন্তু কনটেন্টটা একই রয়ে গেছে। একেক যুগ হয়তো তার নিজস্ব চশমায় একেকভাবে তাকে দেখতে চেয়েছে কিন্তু তার ভেতরের বক্তব্যটা যুগে যুগে একই থেকে গেছে। আর এখানেই একজন কবির কালোত্তীর্ণ হওয়ার পরীক্ষাটা শুরু। কবি যেমন তার কবিতায় নিজস্ব সময়টাকে ধরবেন সফলভাবে, ঠিক তেমনি করে সেই শাশ্বত বোধকেও ছুঁতে হবে তাঁকে। তাঁর কবিতাকে সামনের সময়ের সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে হবে চিরকালীনতার দিকে। খালি এখনকার সময়টাকে ধরলে বুঝতে হবে, এ সৃষ্টির সর্বকালীনতা নেই আবার খালি শাশ্বতটিকে ছোঁয়ার চেষ্টা দেখলে বুঝতে হবে কবির মনের মধ্যে একটি বোধ পোষা আছে বটে, কিন্তু প্রকাশের রাস্তা তার জানা নেই। যে কোনো শিল্পের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য অমিতাংশু। ফিল্মের ক্ষেত্রেই দ্যাখোনা, ফর্ম আর কনটেন্ট সঠিক মিলমিশ না খেলে কি ভালো সিনেমা হয় ? কবিতার ক্ষেত্রেও তাই। সমকালীন ও সর্বকালীনতা যে কবিতায় হাত ধরাধরি করে মানুষের মনে বোধে, চেতনায় চরতে বেরোয়, সেই তো সার্থক কবিতা, সেই কবিতাই তো চিরকালীন।''

অমিতাংশু ঝপ করে একটা প্রণাম করে ফেলে সোমকে। বলে, ''দাদা, মাসে মাসে আপনার কাছে যাবো ?'' সোম খুব নরম চোখে তাকায় ছেলেটির দিকে। তারপর আনমনা গলায় বলে, ''এসো''।

— ''এই যে ছোটদা, এসে গেছো ?'' তথাগত ঘরে এসে ঢোকে।

— ''শুধু এসেই যাইনি রে, এদের সঙ্গে বন্ধুত্বও জমিয়ে ফেলেছি, ''কথাগুলো বলতে গিয়ে সোম বুঝতে পারে, আগের চেয়ে নিজেকে হালকা লাগছে তার।

এখন আর এত অস্বস্তি বোধ করছে না সে । বয়স আর আর্থসামাজিক অবস্থানের তফাৎটা উধাও হয়ে গিয়েছে সাময়িকভাবে তার আর এই সমবয়সীদের মাঝখান থেকে ।

আস্তে আস্তে অন্যদের সঙ্গে আলাপ হয় সোমের । তথা সত্যিই খুব ভালো আয়োজক । আধঘন্টার মধ্যে কবিতাপাঠের আসর শুরু করে দেয় সে । সোম চমকে যায় । বেশীর ভাগই বেশ ভালো লেখে । এই বয়সেই গভীর চিন্তার ছাপ ওদের কবিতাগুলোতে । অমিতাংশু ছেলেটি তো অসাধারণ লেখে । কি করে ছেলেটি ? জানতে হবে ।

— ''ছোটদা, এবার তুমি'', তথাগত-র ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তার ঘোরটা কাটে সোমের । তথার ফ্ল্যাটের সদর দরজাটা পেরোলেই এই হলঘর । দরজা দিয়ে ঢুকেই বসে পড়েছিলো সোম দরজার দিকে পিছন করে । তারমানে এখন হলে উপস্থিত সবাই তার সামনেটাতেই বা বলা যায় সে সবার দৃষ্টির মুখোমুখি । একটু নার্ভাস লাগছে সোমদত্তর । এতগুলো ভালো কবিতা শোনবার পর যদি তার কবিতা না উতরোতে পারে এ আসরে ? এদের আগে তার নিজের পড়ে নেওয়া উচিৎ ছিল । তথা বলেছিলও । সোমই কুণ্ঠায় রাজী হয়নি, এখন দেখছে বলে নিলেই হতো ।

একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সোমদত্ত সেন । না, হাতে কোনও খাতা নেই তার । কাল রাত্রেই একটা কবিতা লিখেছে সে । সেটার পুরোটাই মাথায় আছে তার । সোমদত্ত শুরু করে,

''পরিচয়হীন যেতে হবে বলে তাই
নামকে কবরের মাটিতেই শোয়াই
পরিচয় ছাড়া গেলে পরে একদিন
ডাকতেও পারে দুজনকেই এ খোয়াই ।

অনেক হয়েছে মিথ্যা বসতি যাপন
অনেক হয়েছে পরকে ভাবা আপন
এবার তোমার হাত দুইখানি ধরে
নিভৃত বিকেল সূর্যমুখীর বপন''।

— ''বা ! অপূর্ব'', প্রশংসাটা ভেসে এলো সোমের পিছনদিক থেকে । কেউ একজন এসে দাঁড়িয়েছে দরজায় । ছেলে-মেয়েদের উদ্ভাসিত হাততালির মধ্যেই তথা সম্ভ্রমের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল ''আসুন ম্যাডাম''।

পিছন ঘুরতেই স্থির হয়ে গেল সোম ।

দিনগুলো এখন বড় সুন্দর হয়ে উঠেছে । একাকীত্বের লম্বা পথ পার করে এসে শিঞ্জিনি এখন অনেক স্থিতিশীল মানসিক দিক থেকে । যখন প্রথম এ দেশে আসে, তার নিজস্ব বলতে কিছুই ছিলোনা । নিজস্ব কোনও পরিচয়ও না । তখন সে অনিন্দ্যর স্ত্রী, এইটুকু মাত্র ছিলো তার পরিচয় । অনিন্দ্য যে তাকে ভালোবাসেনি তা নয়, তবে তা নিজের মতো করে, শিঞ্জিনির মতো করে নয় । সে ভালোবাসা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা, মানুষের প্রতি মানুষের নয় । বড় কঠিন এক সময় পার করেছে সে সময়ে শিঞ্জিনি । অনিন্দ্যকে বিয়ে করবার সিদ্ধান্ত যখন সে নেয়, জানত অনিন্দ্য আর তার মেলেনা, সুতীব্র এক অভিমানেই নেওয়া হয়েছিলো সেই সিদ্ধান্ত । আজ শিঞ্জিনি ভাবে, কার উপর ছিলো সেই অভিমান ? এতদিন পরে মনে হয়, তমালের উপর নয় বোধহয় । তমাল আজ তার কাছে একটা প্রতীক মাত্র, যে প্রতীক বলে দেয় শিঞ্জিনিকে কেউ বোঝেনি । এই যে একটা গোটা শহর তাকে তার মতো করে একটুও বুঝছেনা, এটাই বোধহয় শিঞ্জিনির সবচেয়ে বড় অভিমান ছিলো । নীলের উপর ছিলো কি কোনও অভিমান ? বলা মুশকিল । তবে আজ থেকে থেকে নীলের উপর অভিমান হয় তার । মনে হয়, সারা শহরে এই ছেলেটি তো বুঝতে পারত তাকে, তার মধ্যে তো সে সম্ভাবনা দেখেছিলো শিঞ্জিনি তবু নীল তাকে বুঝতে এগিয়ে এলো না কেন ? তাহলে তো আজ সব কিছুই অন্যরকম হতেও পারতো । অনিন্দ্যর একটা বউ দরকার ছিলো, সে অনায়াসেই তো যোগাড় করে নিতে পারতো, কিন্তু শিঞ্জিনির তো একজন মনের মানুষের প্রয়োজন ছিলো ।

বিয়ে করে এ'দেশে আসবার পরে আর পাঁচটা নববিবাহিতা মেয়ের মতো তবু শিঞ্জিনিও দেখেছিলো কিছু স্বপ্ন। কিন্তু কিছুদিন গড়াতেই সে বুঝে যায়, অনিন্দ্যর সে দ্বিতীয় স্ত্রী। অনিন্দ্যর প্রথম ভালোবাসা তার কেরিয়ার, একমাত্র ও কি ? অনিন্দ্যকে দোষ দেয়না শিঞ্জিনি, প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব পছন্দের জায়গা থাকে, প্যাশনের জায়গা থাকে, কিন্তু তা বলে তার পাশের মানুষটির বঞ্চনাকে তো অস্বীকার করা যায় না। কত সময় কত সেলিব্রিটি মানুষের পরিবারের কথা ম্যাগাজিনে পড়েছে শিঞ্জিনি, সেখানে দেখেছে যে ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা পরিবারকে তেমন সময় দিতে পারেননি সৃষ্টির তাগিদে। এ'কথা অনস্বীকার্য যে সৃষ্টির আঙিনায় তিনি সফল ঘরামি, কিন্তু পরিবারের প্রতি তার যে বঞ্চনা, তা অস্বীকার করার উপায়ও তো নেই।

তবু শিঞ্জিনি ভালো আছে এখন। বাবুয়াটা দেখতে দেখতে কতো বড় হয়ে গেল। এখন স্ট্যান্ডার্ড ফাইভে পড়ে বাবুয়া। বাবুয়াকে ঘিরে দিনের অনেকটা সময় কাটে শিঞ্জিনির। সন্তানের সঙ্গে কাটানো সময় গুলো মানুষের জীবনে সাধারণতঃ সবসময়েই উৎকৃষ্ট হয়। আসলে, মানুষ বোধহয় কোয়ালিটি টাইম কাটাতে পারে একমাত্র নিজের সৃষ্টির সঙ্গেই। বাবুয়া তো তারই সৃষ্টি, যেমন তার বাংলা শেখানোর স্কুল। এখন অনেক বড় হয়ে গেছে তার স্কুল। কয়েকশো ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে সারাদিন রমরমিয়ে চলে তার স্কুল। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী ও কর্ণধার হিসাবে শিঞ্জিনির নাম এখন এ'দেশে অনেকেই জানে। শিঞ্জিনিরও আজ এ দেশে নিজস্ব একটা পরিচয় আছে। আর আছে কেভিন। কেভিন বড় ভালবাসে তাকে। কিন্তু সে ভালোবাসা কিছুটা শিশুর মতো। কেভিন আজও তার মন পুরোপুরি বোঝেনা। কোনও দিন বুঝে উঠতেও পারবেনা, শিঞ্জিনি জানে। আসলে, কেভিনের ভালোবাসার মধ্যে মুগ্ধতাজনিত নিবেদনের ভাগটা এত বেশী যে, বোধের উন্মেষের অন্য পথগুলো তাতে ঢাকা পড়ে যায়। কেভিন তার যতখানি প্রেমিক, তারচেয়ে বেশী ভক্ত। কেভিনের প্রকৃত ভালোবাসতে পারবার ক্ষমতা তাই সঞ্চারিত হয় অন্য অন্য দিকে। শিঞ্জিনির সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে কেভিন এই নিয়ে দু'বার বান্ধবী পরিবর্তন করেছে। প্রথমে ছিলো আলজিরিয়া জাত এক ফরাসী মেয়ে, এখন একটি স্প্যানিশ মেয়ে। আসলে কেভিন শিশুর মতই। ও নানা দিকে ভালোবাসা খুঁজে বেড়াতে ভালোবাসে। নির্দিষ্ট এক লক্ষ্যে সাধনার মতো ভালোবাসা কামনা করা ওর ধাতে নেই। তবু কেভিন শিঞ্জিনির মনের বড় কাছের। তাকে ভালোবাসে শিঞ্জিনি। শিঞ্জিনির পাশে থাকে এই মার্কিন যুবক একজন মানুষ হয়েই এটাই সবচেয়ে বড় পাওনা বলে মনে হয় শিঞ্জিনির, সে কেভিন তাকে পূর্ণভাবে বুঝুক আর না বুঝুক। এ, শহরে অন্ততঃ কেউ তো একজন মানুষ শিঞ্জিনিকে দেখবার চেষ্টাটাও করে।

বিকেলটা মরে আসছে। একটা ঝিম ধরা ভাব খুব দ্রুত নেমে আসছে শহরের আনাচে কানাচে। একটু পরেই একটা বিশাল সাইজের কালো পর্দা ঝুপ করে নেমে আসবে আকাশ থেকে যাত্রার যবনিকার মতো আর অমনি এ শহরময় জ্বলে উঠবে উজ্জ্বল আলোরা। শিঞ্জিনির মনে হয়, পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এতক্ষণ যেন সূর্য বলে এক দোর্দন্ডপ্রতাপ অভিনেতার একক অভিনয় চলছিলো। এখন অভিনয় শেষে অভিনেতাটি সাজঘরে ফিরতেই যেন এই যবনিকা পতন আর প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত কৃত্রিম আলোর জ্বলে ওঠা। এতক্ষণ যেন এইসব কৃত্রিম আলোর কোনও প্রয়োজনই ছিলোনা, এতক্ষণ যেন সূর্য তার অভিনয়ের অমিত বিভায় ভরিয়ে রেখেছিলো আদিগন্ত।

হুশ করে অনিন্দ্যর গাড়িটা এসে দাঁড়াতে চিন্তাটা ছিঁড়ে গেল শিঞ্জিনির। এত তাড়াতাড়ি অনিন্দ্যর ফিরে এলো কেন আজ হঠাৎ ? তবে কি অনিন্দ্য অসুস্থ ? একরাশ উদ্বেগ নিয়ে দরজায় ছুটে গেল শিঞ্জিনি। নাঃ তো লাগছে অনিন্দ্যকে, বরং খুব খোশ মেজাজেই আছে বলে মনে হচ্ছে।

ঘরে ঢুকেই শিঞ্জিনিকে দেখে অনিন্দ্য হইহই করে উঠল, ''শিঞ্জিনি, একটা দারুণ খবর আছে। আমরা দেশে ফিরছি''। শিঞ্জিনি, কোনও উত্তর না দিয়ে অনিন্দ্যকে স্থির দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। কি বলতে চাইছে অনিন্দ্য, বোঝবার চেষ্টা করল সে।

অনিন্দ্য আশা করেছিল, শিঞ্জিনির দিক থেকে একগাদা প্রশ্ন ছুটে আসবে তার বলা কথাগুলোর রেশ ধরে। শিঞ্জিনিকে বাহ্যতঃ প্রতিক্রিয়া হীন দেখে ভেতরে ভেতরে একটু দমে গেলেও বাইরের উচ্ছাসটা চুপসোতে দিলোনা অনিন্দ্য, ''বুঝলে,

অ্যাই শিঞ্জিনি, আমরা কলকাতায় ফিরছি। I have got an excellent offer from Kolkata, দারুণ অফার, তুমি ভাবতেই পারবে না, যেমন পোজিশন, তেমন প্যাকেজ। বেশ কিছুদিন ধরেই চলছিলো ব্যাপারটা, আজ The deal has been finalized , অতএব, we are going back to Kolkata. Done ?"

— ''Not at all'', খুব শান্ত একটা উত্তর এল শিঞ্জিনির গলা থেকে, ''আমি তো এখন এখান থেকে যেতে পারবো না অনিন্দ্য। তোমার হয়তো এখানে কাজ শেষ হয়েছে, কিন্তু আমার যে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, অনিন্দ্য'',

— ''মানে ? দপ করে রগটা জ্বলে উঠলেও অনিন্দ্য নিজেকে সামলে নিলো। কি বলতে চাইছে শিঞ্জিনি ?''

— ''মানেটা তো খুব পরিস্কার অনিন্দ্য। একটা সময়ে এ'শহরে আমরা এসেছিলাম তোমার কাজে, এটা সত্যি। কিন্তু সময় অনেক গড়িয়ে গেছে এতদিনে। আজ আমারও কিছু কাজ তৈরী হয়েছে এই শহরে। আমার স্কুল আজ সুপ্রতিষ্ঠিত একটা সংস্থা এ' শহরে। তা ফেলে আমি যাবো কি করে ?''

— ''আরে, আশ্চর্য্য কথা বলছো'', অনিন্দ্য এবার প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ফেলে, ''এক সময়ে তুমিই তো কলকাতা, কলকাতা করে হেদিয়ে মরতে। আর আজ তুমিই ফিরতে চাইছোনা। May I know Why ? তোমার এই শখের স্কুলের জন্য ?''

— ''স্কুল তো আমার শখের নয় অনিন্দ্য। Please আমি তো কখনও তোমার চাকরিকে ছোট করিনি, তুমিও আমার জীবিকাকে ছোট করোনা। জীবিকা মানে কি জানো ? যাকে আশ্রয় করে জীবন বাঁচে। এই স্কুল আমার জীবন, একে আশ্রয় করে আমি বাঁচি। এত কষ্ট করে গড়ে তুলেছি এই স্কুল। এখন আমি একে ফেলে যেতে যাবো কেন ?''। শিঞ্জিনির গলায় অদ্ভুত এক শান্ত ভাব।

''অ! তা আমায় কি করতে হবে ? তোমার স্কুলের জন্য অত ভালো চাকরি, দেশে ফেরবার এত বড় সুযোগ সব ত্যাগ করে এখানে থেকে যেতে হবে ?'', অনিন্দ্যর গলায় ব্যঙ্গ ঝরে পড়ে। সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছে না অপ্রত্যাশিত এই প্রতিবন্ধকতা।

— ''আমি তা একবারও বলিনি অনিন্দ্য। তুমি নিশ্চয় কলকাতায় ফিরতে পারো। আমি বলেছি, আমার পক্ষ্যে এই মুহূর্তে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না''।

— ''এটা তোমার কি জাতীয় পাগলামোর কথাবার্তা শিঞ্জিনি ?'' কঠোর গলায় অনিন্দ্য প্রশ্নটা ছোঁড়ে।

শিঞ্জিনি চুপ করে অনিন্দ্যর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর অদ্ভুত এক অকম্পিত, স্থির গলায় বলে, ''এটা আমার সিদ্ধান্ত, অনিন্দ্য ''।

তথাগত তাহলে শুনলনা, চলেই গেল। সে এত করে বলল, তবু শোনবার প্রয়োজন বোধ করলনা তথাগত। গোলাপি দেওয়ালের একলা ঘরটায় বসে হু হু করে কেঁদে ফেলল পূজা। না, তথাগত তাকে একলা রেখে একটা কোথাও গেছে বলে তার অভিমান হচ্ছে না, তার অভিমান তথাগত তার উদ্বেগটা বুঝলনা বলে। সত্যিই কি জঙ্গলমহল যাওয়ার খুব প্রয়োজন ছিল তথাগতর ? পূজা স্বীকার করে, তথাগতর একটা অন্যরকম মন আছে যে মনের সঙ্গে তার মনের ধরণ মেলেনা। পূজা তো তবুও তথাগতকে ভালোবেসেছিলো, ভালোবাসে। তথাগত কি কোনওদিন বিশ্লেষণ করে দেখেছে যে পূজা তাকে ঠিক কি কারণে ভালোবাসে ? বিয়ের আগে মেলামেশা করবার দিনগুলোতে তথাগত পূজাকে কতটা বুঝেছিলো, পূজা জানে না। এখন পূজার মনে হয় যে তথাগত পূজার ভালোবাসাটা উপভোগ করেছিলো, উপলব্ধি নয়। তথাগত খালি পূজার উপরের যে বস্তুতান্ত্রিকতা, সেটাকেই দেখেছে এবং প্রশ্রয় দিতে গিয়ে ভেবেছে যে এ'ভাবেই পূজা আর সে ভালো থাকবে। কিন্তু ভালোবাসতে গেলে কেবল অন্যজন কিসে খুশী থাকবে তা ভাবলে চলে না, এ'ও ভাবতে হয় অন্য মানুষটি আমায় কেন ভালোবাসছে। ভালোবাসার কারণ না জানা থাকলে, সে ভালোবাসার প্রতি মানুষের বিশ্বাস জন্মায় না। পৃথিবীর সব গভীর বিষয়ের মতো ভালোবাসাও বিশ্লেষণ দাবী করে, নচেৎ প্রত্যাশিত গভীরতা অর্জন করা যায় না। তখন ভালোবাসা উপর-

উপর সন্তুষ্টির ও প্রশ্রয়ের স্তরেই বিচরণ করতে থাকে, উপলব্ধির দীর্ঘ পথে সে পথিক হতে পারেনা। আসলে, তথাগত প্রথম থেকেই, তাকে একটু হালকা চালে নিয়েছে বলে মনে হয় পূজার। তথাগত ধরেই নিয়েছে যে পূজা ভালো মেয়ে, প্রাণবন্ত মেয়ে, তথাগতকে যে কোন কারণেই হোক ভালোবাসে, ব্যস ? এইটুকুই। পূজার আর গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেনি তথাগত, কারণ সে ধরেই নিয়েছে পূজার ভিতরে আর গভীর কিছু নেই। কোথাও গিয়ে পূজার মনন তার চেয়ে একটু নিচের দিকে বিরাজ করছে। কিভাবে তুমি এমন ধারণা নিজের থেকে করে নিলে তথাগত ঠিকমতো বিশ্লেষণ না করেই ? এ তো একধরণের উন্নাসিকতা, নিজের সম্পর্কে এক রকমের অনর্থক অহংকার যা অন্য মানুষের ভেতরটাকে খুঁজে দেখে সম্মান করতে বাধা দেয়। অসম্মানে কি ভালোবাসা হয়, তথাগত ?

প্রতিটি মানুষের মানসিকতা গড়ে ওঠে প্রধানতঃ দুটো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ সে ছোটবেলা থেকে যে পরিবেশে বড় হচ্ছে, বড় হওয়ার পথে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি সে আহরণ করছে, দ্বিতীয়তঃ তার নিজস্ব মনোজগতে যে রঙের খেলা চলে, তার নিজস্ব জীবনদর্শন যে দিশা তাকে দেখায়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। দীর্ঘদিনের অভিযোজন পদ্ধতিতে সে শিখেছে যে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়, নিজেকে সেই পরিবেশের অঙ্গীভূত করে ফেলতে হয়। মানুষ তা করেও। কিন্তু, তার মানে তো এই নয় যে সে মানুষ অন্যরকম কিছু ভাবেনা, ভাবতে পারেনা। হয়তো তার মধ্যে সেসব অন্যরকম ভাবনা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। অন্য কোনও মানুষের ক্ষেত্রে হয়তো পরিবেশ আর পরিস্থিতি সেইসব ভালোগুলোকে প্রকট হতে সহায়তা করেছে। কিন্তু তারমানে তো এই নয় যে, যে মানুষটির মধ্যে এই সম্ভবনা প্রকট সে প্রচ্ছন্ন ভাবনার মানুষটিকে ছোটো ভাববে, সংকীর্ণ ভাববে। এমন ভাবনার মধ্যেই তো একটা সংকীর্ণতা লুকিয়ে আছে। তথাগত তার ক্ষেত্রে ঠিক সেই ভুলটাই করে চলছে। পূজার কেনাকাটা, বস্তুতান্ত্রিকতার দিকে ঝোঁক দেখে তথাগত ধরেই নিয়েছে যে পূজা শুধু ওইটুকুতেই সীমাবদ্ধ। হ্যাঁ, এ'কথা ঠিক পূজা কেনাকাটা করতে ভালোবাসে, শপিং মনে যেতে ভালোবাসে, রেস্তোঁরায় খেতে যেতে ভালোবাসে। এটা ওদের পরিবারের চল। ছোটবেলা থেকে স্বাচ্ছল্যের বড় হওয়া পূজা এমনটাই দেখে আসছে, অভ্যাস করে আসছে। তাতে অসুবিধাটা কোথায় ? মানুষের ভালো লাগবার নির্দিষ্ট সীমারেখা বা নিয়ম-কানুন আছে নাকি ? সে তো তথাগত'র অনেক দোষ আছে। তথাগত মানসিকভাবে একদম স্থিতিস্থাপক নয়, ভীষণ গোঁয়ার। তা বলে কি পূজা সেটাকেই বড় করে দেখবে ? ভালো কাজ করতে পূজারও ভালো লাগে। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে ভালো কাজ করবার খুব ইচ্ছাও তার। কিন্তু গোয়ার্তুমিতে তার বিশ্বাস নেই। ভালো কাজ করবার অর্থ তো এই নয় যে নিজেকে ও অন্যদের অনর্থক বিপদে ফেলবো। অথচ তথাগত সেটাই করছে। পূজার আপত্তিটা কিন্তু ওর ভালো কাজ করা নিয়ে নয়, পূজার আপত্তি এইসময়ে জঙ্গলমহল যাওয়া নিয়ে। ওখানকার পরিস্থিতি এখন খুব উত্তপ্ত। প্রায়ই সংঘর্ষ হচ্ছে, মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে। এখনই ওই বিপদে ঝাঁপ দেওয়ার কি খুব প্রয়োজন ছিলো ? তথাগত মাওবাদী নয়, তথাগত প্রশাসন নয়, তবে ও কেন গেলো ওখানে ? সাধারণ মানুষের ভালো করবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ? সে তো কলকাতা শহরেও করা যেতে পারতো। ওখানেই কেন ? এরমধ্যে আদর্শের পাশাপাশি কি একটা হুজুগও কাজ করছে না ? আর পূজার প্রতি কি তথাগত -র কোনও দায়িত্ববোধ নেই ? তথাগত কি বোঝেনা, সে এখন আর একা নয়, সে বিপদে পড়া মানে অন্য একজনকেও বিপদে ফেলা ? অদ্ভুত ! এমন কি নিয়মিত ফোনটাও করছে না। কেন কে জানে। টাওয়ার পায়না যুক্তিটা খাটেনা বোধহয়। তাহলে কি কাজে এত ব্যস্ত যে পূজাকেই মনে পড়ছেনা ? নাকি পূজা যাওয়ার সময় বাধা দিয়েছিলো বলে পূজার উপর অভিমান হয়েছে ? আর পূজার অভিমান ? তার খবর কে রাখবে ? পূজা যে একদম একলা, সে খবর কে রাখবে ? ঝরঝর করে আবার কেঁদে ফেলল পূজা।

(চলবে)

সৌমিত্র চক্রবর্তী — পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে।

ধারাবাহিক উপন্যাস

শকুন্তলা চৌধুরী

পরবাসী

পর্ব ৭

(৯)

বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বসে বাপ্পার কেবলই মনে হচ্ছিলো – কে যেন নেই ... কিসের যেন অভাব ...! আবার শুরু হলো বাপ্পার চোর-পুলিশ খেলা। কোথায় যেন অন্ধকার গলিঘুঁজিতে হারিয়ে গেছে বাপ্পার ছোটবেলা। যতটুকু বা জমা ছিলো কোথাও, বাবা সেটা নিয়ে চলে গেছেন। বাকীটা পড়ে আছে সেই পথের ধারে যেখানে বাপ্পার যেতে ভয় করে, যেখানে রীতি যেতেই চায়না, আহেলীও বারণ করে যেতে। বাপ্পা তবে কি করবে ? বাপ্পা কি তাকে খুঁজবে, না পালিয়ে বেড়াবে ?!

কিন্তু এবার যেন সব উল্টে গেলো – বাপ্পাকে আর কিছু ভুলতে হবে না, আর পালাতে হবে না। এতদিনে কি তবে বাপ্পা সত্যি "দ্বিজ" হলো? মনে মনে বললো – "মা, তুমি আমাকে নতুন জন্ম দিলে ... আবার। ভাগ্যিস! নাহলে মরেও শান্তি পেতাম না, গলায় পৈতে থাকলেও না!"

খুব সন্তর্পণে, কানে cell phone টা চেপে ধরে, বাপ্পা আস্তে আস্তে বললো – "মা ... ?!" ও প্রান্তে আবার নীরবতা। তারপর ভেসে এলো আবছা হাসির শব্দ – "ঐ সম্বোধনে আমার আর অধিকার আছে কিনা জানি না ... তবে হ্যাঁ, একদিন তোমাকে জন্ম দিয়েছিলাম আমি।"

বাপ্পা গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিল, তারপর হেসে বললো – "জন্ম দিলেই মা, আর কিসের অধিকার ?" এবার দু'তরফেই নীরবতা, কথা নেই।

বাপ্পা যে এতবছর ধরে এতো কথা জমিয়ে রেখেছিলো, সব গেলো কোথায় ? ভেবেছিলো কোনদিন মা'কে পেলে বলবে ... কী বলবে ... সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

শুচিই নীরবতা ভাঙলেন। বললেন – "কোথায় থাকো তুমি এখন ? ... অসুবিধে না হলে একদিন এসো না !"

পরের শনিবার বিকেলে যাবে কথা দিয়ে বাপ্পা ফোন ছেড়ে দিলো। ব্যাগটা টেবিলে রেখে আবার বসে পড়লো। চেয়ারের পেছনে মাথা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করলো। বন্ধ চোখের পাতার ওপর দিয়ে জলছবির মতো ভেসে এলো ক'টা ছবি।

– "মা, কাল তুমি আমাকে লাঞ্চে নুডুলস দেবে – বুঝেছো ?"

– "কেনো রে ?"

– "পার্থ বলেছে যে 'তোর মা রাঁধতে জানে না তাই রোজ তোকে bread দ্যায় লাঞ্চে'।"

– "তুই কেন বললি না যে তোর মাখন আর চিনি দিয়ে bread খেতে খুব ভালো লাগে তাই তোর মা তোকে bread দ্যায় ? ... তোর বন্ধুর কাছে আমাকে এখন রান্নার পরীক্ষা দিতে হবে নুডুলস বানিয়ে ?"

– "বাঃ! আমার বুঝি bread ছাড়া অন্য কিছু খেতে ভালো লাগে না ?"

– "আচ্ছা বাবা, আমার বাদশাজাদা, কাল নুডুলস দেবো!"

– "মা, তুমি আজকে নীল শাড়িটা পরে আমাকে birthday party থেকে আনতে যাবে – ঠিক আছে ?"

– "কেন রে ? নীলশাড়িতে কি আছে ?"

– "শাড়ীতে কিছু নেই, কিন্তু তুমি ঐ শাড়ীটা পরলে তোমাকে না খুব সুন্দর দেখতে লাগে ... ঠিক প্রিন্সেসের মতো। আমি সবাইকে বলেছি যে আমার মা সবার চেয়ে সুন্দর।"

– "কেন তুমি বললে এরকম কথা বাপ্পাবাবু ? তবে তো আমি একদম ছেঁড়া শাড়ী পরে যাবো তোমাকে আনতে !"

– "না মা, please please !"

– "আচ্ছা, আচ্ছা – দেখা যাবে।"

– "বাপ্পা, তুমি হোমওয়ার্ক শেষ করেছো ? ওটা শেষ নাহলে কিন্তু খেলতে যাবে না – সোহম এলেও না।"

– "একটু বাকী মা, সন্ধ্যেবেলা করে নেবো।"

– "না বাপ্পা, সন্ধ্যেবেলা তুমি ঘুমিয়ে পড়বে খেলে এসে। আমি সোহমকে "না" করে দিচ্ছি – কাজ শেষ করে তবে খেলা।"

– "মা, তুমি spoil joy হচ্ছো কেন ?"

– " 'Spoil joy'? ওরে বাবা, তুই তো দেখি অনেক কিছু শিখে ফেলেছিস ?! ... ঠিক আছে, আমি না হয় spoil joy হলাম – কিন্তু তোমায় আমি lazy boy হতে দেবো না। 'For lazy people, it is always party time'! সেটা জানো ?"

– "মাঁ ... যাঁই না ... please মাঁ ... শুঁধু আঁজকে ... please মাঁ ..."

– "বাপ্পা, একদম নাকে কাঁদবে না। কতদিন বলেছি না ? ... কাজ শেষ করে যাও। এইটুকু শুধু বাকী আছে তো, দশমিনিট লাগবে। চট করে শেষ করে নাও।"

ঘোর কেটে গেলো পায়ের আওয়াজে। বেয়ারা দরজা বন্ধ করতে এসেছে। ছটা বেজে গেছে। জিনিসপত্র গুছিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো বাপ্পা। কাল ভোরের ফ্লাইটে দিল্লী যেতে হবে। তাই আজ একটু আগেই বেরোচ্ছিলো অফিস থেকে, কিন্তু ফোনটা এসে সব গোলমাল করে দিলো।

শনিবার সকাল থেকে বাপ্পার ছটফটানি আহেলীর চোখ এড়ালো না। আজ অফিসে না গিয়ে বাড়ী থেকেই কাজ করলো বাপ্পা, ফোনে টিমের সঙ্গে কথা বলে নিলো। তারপর একটা বাজতে না বাজতেই সব তুলে ফেললো। চান করে খেয়ে নিলো, একবার টিভিটা খুললো, আবার ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালো। বাপ্পা যদিও আড়াল করার চেষ্টা করছে, কিন্তু অস্থিরতাটা ঠিক চাপতে পারছে না। আহেলী একবার আস্তে করে বললো – "অত চিন্তা করো না। শান্ত মনে যাও, উনি কি বলেন শোনো – দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে।" বাপ্পা ঠিক শুনলো কিনা বোঝা গেলো না। গল্ফগ্রীন থেকে বিজয়গড় খুব বেশী দূরে না। সাড়ে চারটে বাজতে না বাজতেই বাপ্পা বেরিয়ে পড়লো।

ঠিকানা মিলিয়ে গলির মুখে ছোট দোতলা বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়ালো বাপ্পা। দুটো দরজার কোনটায় বেল বাজাবে ভাবতে ভাবতেই চোখে পড়লো যে গ্রীল দেওয়া একতলার বারান্দায় নেমপ্লেট লাগানো –

"শুচি সেন"। দোতলায় নিশ্চয়ই বাড়ীওলা থাকেন। বাপ্পা ঘুরে এসে কলিং বেল-এ হাত রাখলো। মিনিট দুয়েকের অপেক্ষা, কিন্তু বাপ্পার মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল। চিনতে যাতে ভুল না হয় সেই জন্যে নিজের একটা ছবি মেসেজ করে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলো বাপ্পা।

খুট করে শব্দ হলো। ভেতরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন শুচি সেন, হাল্কা ছাপের হাউসকোট পরা। ওকে দেখে হেসে বললেন – "বাপ্পা ? একমিনিট !"

চাবি এনে গ্রীলের গায়ের তালা খুলতে খুলতে শুচি বললেন – "একা থাকি তো, তাই তালা লাগিয়ে রাখি। কাজের মেয়েটি বিকেলে আসে একবার করে, কিন্তু আজ আসবে না – ছুটি দিয়েছি।"

বাপ্পা একটু হাসলো, নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলো। দরজার পাশে জুতোটা খুলে পর্দা সরিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো – "একটু জল ..."

"নিশ্চয়ই" বলে শুচি ভেতরে গেলেন। বাপ্পা সেই ফাঁকে চারদিকে একবার নজর বুলিয়ে নিলো। খুবই সাদামাটা ফ্ল্যাটের ছোট একটা ঘর, কিন্তু সাজানোয় রুচির ছাপ আছে।

জলের গ্লাস হাতে শুচি ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে ছোট বাটিতে একটু হালুয়া। বাপ্পার সামনে রেখে বললেন – "আগে খুব ভালোবাসতে তুমি হালুয়া খেতে ... এখনও খাও তো ? জিগেস করা হয়নি, তাও করলাম। নাও, খাও। খেতে খেতে বলো – কেমন আছো ? ... আমি তো এখনো বিশ্বাস করতে পারছিনা যে এই আমার সেই বাপ্পা !"

বাপ্পা এবারে চোখ তুলে তাকালো। মায়ের এই আপাত-সহজ ব্যবহার যেন বাপ্পার অপ্রস্তুত ভাবটা এক ধাক্কায় কাটিয়ে দিলো। মা কি সত্যি ভাবছে যে তিন দশকের ব্যবধান কাটিয়ে দেওয়া এতো সহজ ? "বাপ্পা কেমন আছে'র থেকেও 'বাপ্পা কেমন ছিলো'" – সেটাই যে বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। মা কি সেটা বুঝছে না ? নাকি, বুঝেও না বুঝে থাকছে ?! বাপ্পার সেই চিরকালীন smart মা!

একচুমুকে জলটা শেষ করে বাপ্পা বললো – "বিশ্বাস তো আমারো হচ্ছে না ... হয়নি কতদিন ! কি যে বিশ্বাস করবো আর কি যে বিশ্বাস করবো না, এটা ভাবতে ভাবতেই তিরিশ বছর পার হয়ে গেছে – কেমন আছি বা ছিলাম সেকথা ভাবার সময় হয়নি।"

মায়ের মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেলো একমিনিটে। বাপ্পার একটু খারাপ লাগলেও, অপেক্ষায় রইলো মা কি বলে তা শোনার। এই দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনে একটা জিনিস শিখেছে বাপ্পা – সত্যে পৌঁছতে হলে মাটি খুঁড়তেই হবে, ভাবপ্রবণ হয়ে লাভ নেই। আর সত্যটা জানা খুব দরকার বাপ্পার।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে শুচি মুখ খুললেন। "বুঝতে পারছি তুমি কি বলছো, এরচেয়ে নির্মমভাবেও বলতে পারো তুমি আমার হৃদয়হীনতার কাহিনী ... আমি কোনো প্রতিবাদ করবো না। তুমি বা তোমরা কেমন ছিলে এটা জিগেস করাটা হয়তো তোমার কাছে আজ ঠাট্টা বলে মনে হচ্ছে বাপ্পা, কিন্তু এটা ঠাট্টা নয় ... কোনদিন ছিলো না। ওটাই তো ছিলো আমার জীবন। সেই জীবন যখন ছাড়লাম, তখন থেকে বেঁচে থাকাটা হয়ে গিয়েছে শুধু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের খেলা – খেলে যাচ্ছি যতদিন না রেফারি হুইসিল বাজিয়ে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ... তারও বোধহয় আর বেশী দেরী নেই।"

আবার একটা ধাক্কা খেলো বাপ্পা। নিজেকে সামলে নিয়ে বললো – "ডঃ দত্তর কাছে ..."

"হ্যাঁ, তুমি তো জানোই। ধরা পড়তে একটু দেরী হয়ে গেছে – stage 3 তে পৌঁছে গেছে। ... তাতে দুঃখ নেই। তোমার সঙ্গে যে শেষপর্যন্ত দেখা হলো, তাতেই বুঝছি যে সর্বশক্তিমান একজন আছেন এবং আমাকে তিনি ত্যাগ দ্যাননি।" এইটুকু বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন শুচি, হাঁপিয়ে গেছেন মনে হচ্ছে।

"Facebook এ একটা account খুলেছিলাম – কিন্তু তোমায় খুঁজে পাইনি। তোমার বোনের নামটা তো তখনো ঠিক হয়নি তাই ... তোমার নামটাই খুঁজছিলাম, পাইনি। তবু দেখো, দেখা হলো ..." হঠাৎ আসা কাশির দমকে কথাটা শেষ হলো না শুচির।

বাপ্পা ব্যস্ত হয়ে নিজের জলের গ্লাসটা বাড়িয়ে দিলো আর মনে মনে বললো – "এটা সাংবাদিকতা নয় শতদ্রু ব্যানার্জ্জী – stage 3 patient এর জীবন খুঁড়ে দেখাটা কি এই মুহূর্তে এত দরকারী ? তোমার দরকারের বাইরেও কিছু আছে – তার নাম মানবিকতা। সেটা ভুলে যেও না।"

"এই অবস্থায় তোমার তো একা থাকা উচিত না – রাতবিরেতে শরীর খারাপ হলে ... !" এবার খুব সহজভাবে বললো বাপ্পা।

শুচি হাসলেন, সেই ভুবনজয়ী হাসি। তারপর ভাঙা গলায় বললেন – "আমি ঠিক আছি। ... তোমার জন্যে হালুয়া ছাড়া আর কিছু করে উঠতে পারিনি। শিবানী কাল ফ্রিজে রান্না করে রেখে গেছে – আমার সঙ্গে একটু মাছের ঝোল ভাত খেয়ে যাবে? অবশ্য তোমার যদি অসুবিধে না হয় !"

বাপ্পা এটা ভেবে আসেনি। আজ শনিবার – সাম্য আর আহেলীর সঙ্গেই সন্ধ্যেটা কাটানোর কথা। কিন্তু প্রতীক্ষারত দুটো চোখের দিকে তাকিয়ে ও "না" বলতে পারলো না। আহেলীকে একটা text পাঠিয়ে বলে দিলো যে ও রাতে খেয়ে ফিরবে। আহেলী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো – "No problem."

রান্নাঘরের লাগোয়া ছোট্ট একফালি ডাইনিং রুমের টেবিলে যখন হাত ধুয়ে খেতে বসলো বাপ্পা, তখন ও অনেক সহজ হয়ে গেছে। কুমড়োর তরকারী দেখে নাক সিঁটকে বললো – "আবার কুমড়ো ?"

শুচি হেসে ফেললেন – "আমি যদি জানতাম যে বাপ্পাবাবু আজ আমার সঙ্গে ডিনার করবেন, তাহলে শিবানীকে আগেই বলে দিতাম যে 'নো কুমড়ো এ্যাণ্ড নো পটল'! ... মাছটা কিন্তু তোমার পছন্দের, দ্যাখো।"

আড় মাছের ঝোলটা সত্যি খুব তৃপ্তি করে খেলো বাপ্পা। খেতে খেতে গল্প শুরু হলো।

"এই বাড়িতে তুমি ক'দিন আছো ?" বাপ্পা জিগেস করলো।

শুচি বললেন – "প্রথম থেকেই। বছর পনেরো আগে যখন দেশে ফিরি, তখন বম্বেতেই একটা ছোট কাজ নিয়ে এসেছিলাম। কলকাতায় ফিরতে চাইছিলাম, vacancy দেখে দেখে apply করতাম। বছর সাতেক আগে এই স্কুলের কাজটা পেলাম। প্রথম কয়েকমাস working girls' hostel এ ছিলাম। তারপর একজন colleague এই বাড়ীটার খবর দ্যান।"

"দেশে ফিরে ... মানে ..." বাপ্পা খুব সন্তর্পণে জিগেস করলো।

"মানে বম্বেতে প্রায় পাঁচ বছর কাটানোর পর, কানাডায় কাটিয়েছি আরো বছর দশেক। ... সেই কানাডা যাওয়া যে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে, এটা আমি জানতাম। তাই দ্বিধা করেছিলাম, অনেক ভেবেছিলাম। ততদিনে আমি বম্বের আদবকায়দায় অভ্যস্ত, পাঁচবছরের চাকরির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, তিরিশোত্তর, আত্মনির্ভরশীল শুচি ব্যানার্জ্জী। হ্যাঁ, তখনও আমি শুচি ব্যানার্জ্জীই ছিলাম।

সুশোভনের সাহায্যে চাকরি নিয়েছিলাম, বম্বেতে গিয়ে প্রথম ওর বাড়ীতে উঠেওছিলাম – কিন্তু উঠেছিলাম ওর ছোটবেলার বন্ধু মিসেস শুচি ব্যানার্জ্জী হিসাবেই। ...

আমার চেনাজানার মধ্যে এমন আর কেউ ছিলো না যে সাহস করে এই কাজটা করতে পারতো, শুধু আমার অনুরোধে ! ... বিবাহিতা এক মহিলাকে সংসার ছাড়তে প্ররোচিত করার অভিযোগ থেকে শুরু করে তাকে নিজের বাড়ীতে রাখা – কত না অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছে ওর দিকে! কিন্তু সুশোভন ওসব গ্রাহ্য করতো না, ও নিজে যা ভালো বুঝতো তাই করতো।

আমাকে সাহায্য করা ছাড়া সুশোভন আর কিছুই করেনি, আমাকে কোনভাবেই কোনদিন কোনকিছুর জন্য জোর দ্যায়নি। ... আমিও তোমার বাবাকে তখনো ডিভোর্স করিনি।

বম্বে যাওয়ার কয়েকমাসের মধ্যেই আমি সুশোভনের বাড়ীর কাছে ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে উঠে গিয়েছিলাম। সুশোভনের সঙ্গে আসা-যাওয়া চলতো, ওর বন্ধুরা পার্টি করলে আমাকেও ডাকতো, স্বল্পপরিচিত শহরে কোনো official কাজে সুশোভনই আমাকে সাহায্য করতো। ... আমি একটা অন্য জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছিলাম।

মনের ক্ষত আস্তে আস্তে শুকিয়ে আসছিলো। নিজের ওপর আস্থা ফিরে আসছিলো – বুঝে গিয়েছিলাম যে তোমার বাবা এবং ঠাকুমা আমাকে আর চেপে রাখতে পারবেন না। এখন আমি আমার নিজের শর্তে জীবন কাটাতে পারি, প্রয়োজনে এই ব্যাঙ্কেরই কলকাতা শাখায় গিয়ে চাকরি করতে পারি।

সত্যি বলতে কি, তোমার বাবাকে ছেড়ে থাকতে কোনো কষ্টই হচ্ছিলো না কিন্তু তোমার এবং তোমার বোনের মুখদুটো মাঝেমাঝেই স্বপ্নে আমায় তাড়া করে ফিরতো।

এইরকম সময় সুশোভন কানাডার ইমিগ্রেশন পেয়ে গেলো। ও কয়েকবছর আগেই এ্যাপ্লাই করেছিলো – বিজনেস্ ক্যাটাগরিতে। ওর বিজনেস তখন বেশ বেড়ে উঠেছে, প্রচুর assets – পেয়েও গেলো ইমিগ্রেশন।

সুশোভন যখন ইমিগ্রেশনের জন্যে এ্যাপ্লাই করেছিলো, আমি বম্বে যাওয়ার বছর দুয়েকের মাথায়, আমি তখন তোমার বাবার সঙ্গে একবার কথা বলতে চেয়েছিলাম ... কলকাতায় গিয়ে দেখাও করতে চেয়েছিলাম। আমার বন্ধু দীপা তোমার বাবাকে ফোন করেছিলো।

আমার মনে হয়েছিলো যে এই দু'বছরের বিচ্ছেদ হয়তো আমাদের দু'জনকেই অনেক কিছু শিখিয়েছে – আমরা হয়তো পরস্পরকে সম্মান করে, তোমার ঠাকুমার শাসনের বাইরে এসে, নিজেদের ছেলেমেয়েদের বড়ো করতে পারবো শান্তির সঙ্গে। কলকাতায় না হোক, বম্বেতে। ...

কিন্তু হলো না। তোমার বাবা বলে দিলেন যে আমার মতো চরিত্রহীন মহিলার সঙ্গে তিনি কথাই বলতে চান না, আমি যেন ভবিষ্যতে আর কোনদিন যোগাযোগ করার বা তোমাদের কারুর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা না করি। ... এরপর আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেলো খুব নিঃশব্দে। এ্যালিমনি নেওয়ার আমার ইচ্ছে ছিলো না, আর কাস্টডি চাইলেও পেতাম না জানি – তাই মিউচ্যুয়াল কনসেন্টে খুব দ্রুত সব শেষ হয়ে গেলো।

মানসিকভাবে তখন আমি এতো বিধ্বস্ত যে একা বম্বেতে থেকে যাওয়ার কথা আর ভাবিনি।

বহুবছর ধরে নিঃশব্দে অপেক্ষা করে থাকা, আমার পরম শুভাকাঙ্খী, সুশোভনের হাত ধরে পাড়ি দিলাম কানাডায় – ওর স্ত্রী হয়ে পা রাখলাম আরেক নতুন জীবনে। ... সেখানে কাটালাম দীর্ঘ দশ বছর। ... সেই দশবছরের জন্যে আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ – সারাজীবনের বাঁচা বেঁচে নিয়েছি আমি ঐ ক'বছরে। ... তারপর ... আবার একাকীত্ব। সেবারের সেই একাকীত্ব ছিলো বড়ো বেদনার, বড়ো অস্থিরতার। আমি আর টিকতে পারলাম না কানাডায় – এগারো বছরের মাথায় ফিরে এলাম দেশে।

... তোমরা ততদিনে বাড়ী বদল করেছো। কোথায় গেছো তা কেউ বলতে পারলো না। আমি কয়েকবছর পরে গিয়েছিলাম একবার পুরোনো পাড়ায় ... "আমায় অবশ্য কেউ চিনতে পারেনি।" শুচি থামলেন।

"আমরা তো টালিগঞ্জ ছেড়ে গল্ফগ্রীণে চলে এসেছি প্রায় ১৮/১৯ বছর হলো। ... ঐ পাড়ার কারুর সঙ্গেই আর যোগাযোগ নেই।" বাপ্পা বললো।

"ভালোই করেছিলে। ... আচ্ছা তোমার বোনের ছবি আছে কোনো তোমার কাছে ?" শুচি একটু সঙ্কুচিত ভাবে বললেন।

"কে, রীতি ? হ্যাঁ, আছে নিশ্চয়ই ... last time যখন ব্যাঙ্গালোর গিয়েছিলাম তখন তোলা ... এই যে ... রীতি আর রাজ, ওর boyfriend – ওরা একসঙ্গেই থাকে।" বাপ্পা ফোনটা এগিয়ে দিলো।

"রীতি ... আর কোন নাম নেই ? একটাই নাম ? ... ও বিয়ে করবে না ?" শুচি জিগেস করলেন।

"ওর একটাই নাম। বিয়ে ? বোধহয় না ... ও বিয়েতে বিশ্বাস করে না। রবি, মানে ওর আগের boyfriend, তাকেও বিয়ে করতে চায়নি। রাজের সঙ্গে তো condition করে নিয়েছে যে বিয়ের কথা তুললেই break up! রীতি সব নিজের terms-এ করে ... ঠাকুমাকে তো প্রায় কাঁদিয়ে ছেড়ে দিতো। বাবার কথাও শুনতো না।" বাপ্পার মুখের হাসিটা হঠাৎ এখানে এসে একটু হোঁচট খেলো।

শুচির মুখের ওপর দিয়ে একটা ছায়া ভেসে উঠে মিলিয়ে গেলো।

যখন কথা বললেন সেটা ভেসে এলো যেন অনেক দূর থেকে।

"তোমার বাবার খবরটা আমি পেয়েছি অনেকদিন পরে, এই সাত-আটমাস আগে। ... তুমি নিশ্চয়ই জানো যে বাড়ী ছাড়ার পর আমার মা-বাবা আমার সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ রাখেননি। রুচি, আমার বোন, আর আমার দাদা, সুমন – ওরাও আমাকে পর করে দিয়েছিলো। কারুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অনুমতি ছিলো না আমার। প্রায় একবস্ত্রে টালিগঞ্জের বাড়ী ছেড়েছিলাম – মা তবু আমাকে দরজার ভেতরে ঢুকতে দ্যাননি। তখন আমি আর ও বাড়ীর মেয়ে না, ওখান থেকে বিয়ের আগের দুটো শাড়ীও আমি আনতে পারিনি। আমার ছোটবেলার বন্ধু দীপার কাছে উঠেছিলাম ক'দিনের জন্যে, দীপার সঙ্গেও ওরা তাই কথা বলতো না। তারপর বম্বে চলে যাওয়ার পর তো দাদা উকিলের চিঠি পাঠিয়েছিলো – ওদের দু'মাইলের মধ্যে এলে আমার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ... সেসব অনেকদিনের কথা। তারপর বাবা মারা গেলেন, দীপার কাছে শুনে আমি অনেক কাকুতি মিনতি করেছিলাম – দাদা বলে দিলো আমি যেন শ্মশানেও না যাই। তারপর আমি দেশ ছাড়লাম। ছাড়ার আগে অবশ্য বাড়ীতে যেতে চেয়েছিলাম, তোমাদের কাছে – কিন্তু অনুমতি মেলেনি। কানাডায় থাকাকালীন মায়ের মৃত্যুসংবাদ পাই, দীপার কাছেই। রুচি বিয়ের পরে তখন Middle East এ settled, দাদা transferable job নিয়ে দিল্লিতে। মায়ের মৃত্যুর পর নাকি দাদা একবার এসেছিলো – কল্যাণীর বাড়ী বেচে দিয়ে দিল্লিতে ফিরে গেছে শুনেছিলাম। সুশোভনের সঙ্গেও ওর বাবা-মা'র কোনো যোগাযোগ ছিলোনা। কল্যাণীর ভাড়া বাড়ী ছেড়ে দিয়ে ওনারা Auroville-এ চলে গিয়েছিলেন। ওখানেই মারা যান – একমাত্র সন্তানের মুখ দেখতে চাননি আর, মুখাগ্নিও নিতে চাননি। দীপারাও এরপর Salt Lake এ চলে যায় – সব যোগাযোগই ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো কল্যাণীর সঙ্গে। হঠাৎ এই কিছুদিন আগে দীপা ফোন করেছিলো – ওর সঙ্গে নাকি কল্যাণীর পুরোনো পাড়ার কার দেখা হয়েছে, পাড়ার সবার খবর বলতে বলতে তোমার বাবার কথাও বলেছেন তিনি। কিন্তু তোমরা কোথায় থাকো তা বলতে পারেননি ... তোমরাও তো বোধহয় তোমাদের দাদু-ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর কল্যাণীর বাড়ী বিক্রী করে দিয়েছিলে, উনি তাই তোমাদের সম্বন্ধে আর কিছু জানেন না।" অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে শুচি হাঁপাতে লাগলেন। হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাসটা নিয়ে মুখে ধরলেন।

(১০)

বাপ্পাকে বারান্দা থেকে হাত নেড়ে বিদায় দিয়ে, গ্রীলে তালা আটকে, দরজা বন্ধ করে শুচি বাথরুমে গেলেন। দাঁত মাজতে মাজতে আয়না দিয়ে একবার নিজেকে দেখলেন। প্রায় তিরিশ বছর আগের সেই বাপ্পার মা'কে মনে করার চেষ্টা করলেন। তারপর নাইটি পরে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু ঘুম এলো না।

বহুদিন বাদে কারুর সঙ্গে বসে একসাথে খেলেন। "কারুর" সঙ্গে না, বাপ্পার সঙ্গে ! সেই বাপ্পা ! ...

কতদিনের স্মৃতিরা যেন এসে একসঙ্গে ধাক্কা মারলো মনের দরজায়। শুধু বাপ্পা না, মনে পড়লো বাপ্পার সেই ছোট্ট বোনকে, মনে পড়লো লাপ্পাকে।

"নাঃ, নাঃ ... আমি আর পেছন ফিরে তাকাতে চাই না ... আমায় মুক্তি দাও, হে ঈশ্বর!" শুচি জোর করে চোখ বন্ধ করলেন।

"মুক্তি কি চাইলেই মেলে ? ... সব পাওনাগণ্ডার হিসাব মেলাতে হবে না ?" কে যেন বললো পেছন থেকে।

কে ও ?

সুশোভন তখন সামনে এসে হাসছে – "প্যানপ্যান করে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাতে শোনাতে কানের পোকা বার করে দিয়েছো সেই পনেরো বছর বয়স থেকে, এখন তো আর কিছু কানে ঢুকতেই চায় না। ... কানাডা গিয়ে কাজের শেষে বাড়ী এসে করবো কি ? তোমার প্যানপ্যানানীই নাহয় শুনবো।"

– "না সুশোভন, তোমার বাবা-মা এটা কিছুতেই মেনে নেবেন না। তুমি ওনাদের একমাত্র সন্তান, কেন দুঃখ দেবে ওনাদের ?"

– "ম্যাডাম, দুঃখ আমি কাউকে দিই না। কিন্তু ওনারা এই ধর্ম-না-মানা কুলাঙ্গার ছেলেকে এমনিতেই প্রায় ত্যাগ দিয়েছেন – কানাডা দূরে থাক, আমার বম্বের বাড়ীতেই একদিনের জন্যেও পা দ্যাননি। সুতরাং ওনাদের দুঃখের কথা না ভেবে আমি যদি আমার আনন্দের কথা একটু ভাবি, তাতে কোনো দোষ আছে ?"

– "তুমি জানো না তুমি কি বলছো, সুশোভন।"

– "আমি খুব ভালো জানি আমি কী বলছি, শুচি। আমি বলছি যে তুমি আমার সঙ্গে কানাডা চলো। শীর্ষ বা ছেলেমেয়েদের কাছে ফিরতে চাইলে আমি তোমায় বাধা দেবো না, কিন্তু সে রাস্তা যখন আপাতত বন্ধ তখন তোমায় একা, ডিপ্রেশনের ওষুধের সঙ্গে রেখে, আমি চলে যেতে চাই না। ... Now tell me, will you marry me?"

– "Yes, I'll ..." চোখের জল মুছে শুচি বলেছিলো।

সুশোভনের বন্ধুবান্ধব আর শুচির অফিসের কিছু সহকর্মীদের নিয়ে ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান হলো – রেজিস্ট্রী করে বিয়ে আর তারপর খাওয়া-দাওয়া। সুশোভনের ইমিগ্রেশনের কাগজে শুচি সেনের নাম যোগ হলো। কয়েকমাসের মধ্যেই সব ফর্ম্যালিটি শেষ এবং হাতে কাগজ – সামনে কানাডা।

গোছগাছ কেনাকাটা শুরু হয়ে গেলো। বম্বের ফ্ল্যাটটা সুশোভন বিক্রী করে দিলো। ফিরবেই না যখন, তখন রেখে লাভ কি ? তার চেয়ে যতটা পারা যায় ক্যাশ সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ভালো। নতুন মালিক কিছু ফার্নিচারও কিনে নিলেন, বাকী সব সুশোভন অফিসের লোকজনদের দিয়ে দিলো।

ব্যবসাও বিক্রী করে দিয়েছিলো সুশোভন – নতুন মালিক সব বুঝে নিচ্ছেন সুশোভনের থেকে। সুশোভন কনসাল্ট্যান্ট হিসেবে অফিসে যাবে এই দুইমাস, সেরকমই শর্ত হয়েছে বিক্রীর সময়।

অফিসের পুরোনো লোকেরা সুশোভনের নিজের পরিবারের মতো হয়ে গিয়েছিলো। তাদের খুব মন খারাপ। সবাই মিলে ফেয়ারওয়েল ডিনারে নিয়ে গেলো সুশোভন আর শুচিকে একদিন।

সুশোভনও একটু অন্যমনস্ক হয়ে রইলো সেদিন বাড়ী ফেরার পথে।

শুচিকে বললো – "যখন আমার নিজের মা-বাবাও আমার ওপর বিশ্বাস রাখেননি, মিঃ দেশাই আর বোসবাবু তখন থেকে আছেন আমার সঙ্গে। ... এ'সব সম্পর্কের কোনো নাম হয় না।"

শুচি মাথা নেড়ে সায় দিলো, সে জানে সুশোভন কি বলতে চাইছে। সে নিজেই কি দেখেনি জীবনে আত্মীয় পর হয়ে গেলেও, কিছু অনাত্মীয় কেমন আপন হয়ে যায় ?!

তারপর একটু ইতস্তত করে বললো – "তুমি যাওয়ার আগে একবার তোমার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে এসো, সুশোভন। আমার নাহয় বাপের বাড়ী ঢুকতে মানা, তোমার তো না ?"

সুশোভন বললো – "কোনো লাভ নেই, শুচি। তুমি তো দেখেছো বাবার চিঠি ! ... মনি অর্ডারও ফেরত এসেছে।"

শুচি বললো – "লাভের কথা নয়, এটা তোমার কর্তব্য। ... তুমি হঠাৎ জানালে যে কানাডা যাচ্ছো ... তারপর জানালে যে আমায় বিয়ে করছো ... উনি তো রাগ করতেই পারেন !"

সুশোভন কিছু বললো না।

ফ্ল্যাটের নতুন মালিক সম্পত্তির দখল নেবেন মাসের পয়লা তারিখে, শুচি আর সুশোভনের কানাডার ফ্লাইট তিন তারিখে। সেই দু'দিন বোসবাবুর আতিথ্যে থাকবে শুচি-সুশোভন।

তার ঠিক আগের weekend-এ, সকালের ফ্লাইট নিয়ে সুশোভন কলকাতা গেলো। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা গাড়ী নিয়ে কল্যাণী চলে যাবে, এইরকমই প্ল্যান। শুক্রবার সকালে গেলো, রবিবার বিকেলে ফেরার কথা।

কিন্তু ফিরে এলো শনিবার বিকেলে।

সুশোভনের বাবা-মা কোনো রাগারাগি করেন নি।

শুধু খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে, বাইরের ঘরে বসে, শান্তভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে সুশোভনকে তাঁরা আর নিজেদের পুত্র বলে মনে করেন না। পরের মাসের শেষে ওনারা এই বাড়ী ছেড়ে দিচ্ছেন, Auroville এ চলে যাচ্ছেন। সুশোভনের চিন্তা করার বা টাকা পাঠানোর কোনো দরকার নেই – পেনশনের টাকা দুজনের জন্যে যথেষ্ট।

বাবাই বললেন যা বলার, মা চিরদিনের মতো শুধু নীরবে সায় দিয়ে গেলেন।

সুশোভন একবার ভেবেছিলো তখনই বেরিয়ে আসে।

কিন্তু মায়ের নীরব চোখের মিনতিটা বুঝতে ওর অসুবিধে হয়নি।

তাই রাত্রিটা থেকে, পরের দিন মায়ের হাতের সেই প্রিয় কড়াইশুঁটির কচুরি দিয়ে লাঞ্চ করে, বেরিয়ে পড়েছিলো।

বাবা শান্তভাবে প্রণাম নিলেন, মা চোখে আঁচল চাপা দিলেন।

গাড়ীতে উঠে আর পেছন ফিরে তাকায়নি সুশোভন।

শুচি চুপচাপ বসে শুনলো, আর মনে মনে বললো – "হে ঈশ্বর, আর কতো পাপের ভাগী হবো আমি ?"

সেই রাত্রে, সুশোভন ঘুমিয়ে পড়ার পর, বাথরুমে গিয়ে প্রাণভরে যত জমিয়ে রাখা কান্না সব কেঁদেছিলো শুচি। তারপর তৈরী হয়েছিলো এক নতুন পথে চলার জন্যে।

নিজেকে বলেছিলো – "আর কান্না নয়, আর চেষ্টা নয় ... আর নিজেকে দোষ দেওয়া নয়। যে রাস্তায় পা বাড়িয়েছো, সেই রাস্তার দিকে তাকাও।"

এখনো ভাবলে অবাক লাগে শুচির – কী গভীর ছিল সেই যাত্রা !

পুরোনো জীবনের সব সুতো ছিঁড়ে নতুন কিছুর সন্ধানে, সাতপাকের বাঁধন কেটে কাগজের দস্তখত সম্বল করে, জুনমাসের এক গ্রীষ্মের ভোরে ঘাম মুছতে মুছতে, প্রাচ্যের গণ্ডী থেকে জীবনে প্রথম আকাশবাহী হয়ে, ধুলোবিহীন নাতিশীতোষ্ণ সন্ধ্যার আলোয় পশ্চিমের দরজায় অবতরণ।

আজো মনে আছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। শাড়ীর ওপর শাল ছাড়াও, সদ্য কেনা কোট জড়ানো। সুশোভনও সোয়েটারের ওপর জ্যাকেট পরে নিয়েছে। জুন মাসের প্রথম, কিন্তু শীতের আভাস এখনো যায়নি কানাডায়। অন্তত, তখন তাই মনে হয়েছিলো কলকাতা এবং বম্বেতে জীবনের সবকটি শীতঋতু কাটানো শুচি এবং সুশোভনের। মনে হচ্ছিলো যেন কলকাতার নভেম্বরমাসের শীত – এরা একে summer বলে?!

কয়েক বছর থাকার পর অবশ্য অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো। তখন আর জুনমাসের হাওয়ায় শীত করতো না।

ক্যানাডিয়ান এ্যাম্বাসীর সহায়তায় শহরের কয়েকটি হোটেলের নাম পাওয়া গিয়েছিলো, তারই একটিতে একমাসের জন্য বুকিং নিয়েছিলো সুশোভন।

এই হোটেলের ছোট ছোট স্যুইটগুলো দীর্ঘকালীন আবাসিকদের জন্যে তৈরী। যারা কাজে এসেছে কিছুদিনের জন্য, অথবা বাড়ী বা এ্যাপার্টমেন্ট খুঁজছে – ঠিক এক-দু'দিন থাকার মতো নয়। নিজেরা রান্না করে নেওয়ার মতো ব্যবস্থা রাখা আছে এক বেডরুম, এক বাথরুম আর বাসনপত্র শুদ্ধু ছোট্ট কিচেনেটওয়ালা এই স্যুইটে। নীচের ব্রেকফাস্টরুমে সকাল সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে নটা অবধি ব্রেকফাস্ট রাখা থাকে – ব্রেড, বেগল, সিরিয়াল আর ফল। বাকী সারাদিনের খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদের – হয় রান্না করো, নাহয় কিনে খাও।

মেইড এসে রোজ সকালে স্যুইট পরিষ্কার করে, নতুন তোয়ালে সাবান দিয়ে যায়। সব মিলে ভালোই ব্যবস্থা।

এয়ারপোর্ট থেকে আসার পথে, প্রথম রাতের খাবারটা কিনে এনেছিলো সুশোভন।

জীবনে সেই প্রথম স্বনামধন্য ম্যাকডোনাল্ডের বার্গার খেলো শুচি।

তারপর শাড়ী ছেড়ে নাইটি পরে নিলো – চোখ জুড়ে আসছে ঘুমে।

মশা-মাছি-পোকা নেই। তাই মশারি বা "গুড নাইট"-এরও প্রশ্ন নেই।

ধপধপে বিছানার ওপরের তুলতুলে ঢাকাটা তুলে, নরম গদীতে গা ছেড়ে দিল শুচি।

ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়তে দেরী হলো না।

যদিও ভালো ঘুম হলো না।

ছেঁড়া ঘুম ... ছেঁড়া স্বপ্ন ... কল্যাণীর রাস্তায় ফুচকা ... দীপা ... রবীন্দ্রসদনে প্রোগ্রাম ... "পরবাসী, চলে এসো ঘরে" ... টালিগঞ্জের গলি ... জুহু ... বাপ্পার ডাক – "মা, বোনটা কাঁদছে" ... মা বলছে – "এখানে জায়গা হবে না তোমার" ... চারদিকে মেঘ ... তার মাঝে পুষ্পকরথে শুচি ... কাঁদতে কাঁদতে ... সাগর পেরিয়ে ...

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেলো।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো মাঝরাত। কোথাও কোনো শব্দ নেই। মনে পড়লো যে এটা কানাডা। কলকাতা বা বম্বে হলে মাঝরাতেও শব্দ শোনা যেত। পাশে সুশোভনও উসখুস করছে।

"আর ঘুম হবে না ... জেটল্যাগ ... একটু কফি বানাই" বলে উঠে পড়লো ও। কিচেনেটে কফি বানানোর সব সরঞ্জাম মজুত। সুশোভন জল গরম করতে দিয়ে বাথরুমে গেলো।

শুচি উঠে এসে পর্দা সরিয়ে রাস্তায় চোখ রাখলো। চওড়া রাস্তা নিওনের আলোয় ঝকঝক করছে। সামনে কয়েকটা গাড়ী পার্ক করা। এয়ারকণ্ডিশনড ঘরের জানলা খোলা যায় না, তাই বুঝতে পারলো না যে বাইরের তাপমাত্রা এখন কত।

ঘরের মধ্যে থার্মোস্ট্যাটিক কন্ট্রোলের কল্যাণে সদাই বসন্ত।

কফির কাপ হাতে নিয়ে টিভিটা অন্ করে খাটে এসে বসলো সুশোভন। সারারাতই এখানে টিভিতে কিছু না কিছু হচ্ছে। পরপর কয়েকটা চ্যানেল ঘোরালো। একটায় মুভি দেখাচ্ছে – তাই দেখতে বসে গেলো দুজনে। খানিকক্ষণ দেখার পর শুচি বললো – "কিরকম অদ্ভুত লাগছে!"

"কেন ?" সুশোভন বললো।

"আমরা যেন একটা দ্বীপে আটকে গেছি ... কেউ কোথাও নেই ... কাউকে চিনি না ... আমাদেরও কেউ চেনে না ... রাস্তাঘাট লোকজন সব অজানা ... এ' আমরা কোথায় এলাম, সুশোভন ? এখানে আমরা ভালো থাকবো তো ?" শুচি সংশয় ভরা চোখে তাকালো সুশোভনের দিকে।

সুশোভন হেসে বললো – "ভালো থাকবো বলেই তো এসেছি। নিজের ঘরের কুয়োতে আটকে থাকার চেয়ে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে দ্বীপে আটকে যাওয়াও ভালো। নতুন জায়গায় সাহস করে পা না ফেললে, তুমি বুঝবে কি করে যে পুরোনো জায়গাটার চেয়ে ভালো কিছু আছে কিনা ?"

শুচি বললো – "তা ঠিক, কিন্তু ..."

"কিচ্ছু কিন্তু নয় ... সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার রবিঠাকুর কি একটা লিখেছিলেন না – "কত অজানারে জানাইলে তুমি ..."? সবসময় নিজের horizon বাড়ানো ভালো, অত চিন্তা করলে কিছুই হয় না। ... নাও চলো তো, ভোর হওয়ার আগে আরেকটু ঘুমের চেষ্টা করো।" টিভি আর আলো নিভিয়ে দিলো সুশোভন।

শুচিও বেডসাইড টেবিলে কফির কাপ রেখে শুয়ে পড়লো। সুশোভন হাত বাড়িয়ে শুচিকে কাছে টেনে নিলো।

ঘুম যখন ভাঙলো তখন বেলা আটটা – হাউসক্লিনিং সার্ভিস ঘর পরিষ্কার করবে বলে দরজা ধাক্কাচ্ছে। ধড়মড় করে উঠে বসলো শুচি। সুশোভনকেও ডেকে তুললো।

চোখ মুছতে মুছতে গিয়ে দরজা খুললো, আর কি যেন বলে আবার ফিরে এলো সুশোভন।

শুচি বললো – "কি হলো?"

সুশোভন বললো – "কিছু না ... ক্লিনিং সার্ভিস ঘর পরিষ্কার করবে। "ডোন্ট ডিস্টার্ব" বোর্ড লাগাতে ভুলে গেছিলাম রাতে। যাক গে, ভালোই হয়েছে – বেশী ঘুমোলে রাতে আবার ঘুম আসবে না আর ব্রেকফাস্টও ফুরিয়ে যাবে। চলো, রেডি হয়ে নাও – ব্রেকফাস্ট খেয়ে আসি। ততক্ষণে ওরা ঘর পরিষ্কার করে যাবে – পাশের ঘরটা আগে করে আমাদেরটায় আসছে। ... ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরোতে হবে।"

শুচি উঠে ব্যাগ খুলে টয়লেটরি বার করলো। সুশোভনকে বললো বড়ো স্যুটকেসটা খুলে দিতে – জামাকাপড় বার করবে। তালার চাবিগুলো সুশোভনের পাউচে, পাসপোর্ট আর ইমিগ্রেশনের কাগজের সঙ্গে রয়ে গেছে।

চারটে স্যুটকেস – দুটো শুচির আর দুটো সুশোভনের। একটা হাল্কা হাসি খেলে গেলো শুচির ঠোঁটে। জীবনের যাবতীয় সম্পদ এই দুটো স্যুটকেসে ভরে শুচি সাগরপাড়ি দিয়েছে ... এক জীবন থেকে আরেক জীবনে পাড়ি দিয়েছে বলাই ভালো। ইমিগ্রেশন নিয়েছে, সারাজীবনের জন্য।

কিন্তু কিই বা ধরে এই দুটো পেল্লায় স্যুটকেসে! শুচির হাসি-কান্না, আশা-হতাশা – এদের কি সব স্যুটকেস ভরে নিয়ে আসতে পেরেছে শুচি ? নাকি সেসব ইমিগ্রেশনে এ্যালাউড নয় ? ... তারা কি সব তবে হারিয়ে গেলো ?

সুশোভন রেডি হয়ে বাথরুমে থেকে বেরিয়ে এলো। শুচিকে তাড়া দিলো আবার।

শুচি শালোয়ার-কামিজ হাতে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলো।

ব্রেকফাস্ট রুমটায় এখন বেশী ভিড় নেই। প্রায় নটা বাজে – বেশীরভাগ লোকই ব্রেকফাস্ট খেয়ে চলে গেছে। শুচি আর সুশোভন দু'টো বেগল টোস্ট করে, ক্রিমচীজ লাগিয়ে, প্লেটে করে নিয়ে এলো। সঙ্গে ছোটগ্লাস ভর্তি কমলালেবুর রস আর একটা করে banana muffin, ডিজপোজেবল কাগজের গ্লাস ভর্তি চা।

জানলার ধারের টেবিলটায় এসে বসলো দুজনে।

ব্রেকফাস্ট রুমটা হোটেলের পিছন দিকে। জানলার পাশে পার্কিংলট আর তারপর জঙ্গল। পার্কিংলটের চারপাশে মরশুমী ফুলের বাহার। আর একটু এগোলেই প্রকৃতি।

ঘন সবুজ পাতায় ঢাকা গাছের মাথাগুলো নীল আকাশকে আলগোছে ছুঁয়ে আছে। দূষণমুক্ত হাওয়ায় ডানা ছড়িয়ে উড়ে গেলো দুটো সীগাল।

শুচির মনে হলো স্বর্গ বোধহয় এরকমই ... শুচি কি তবে মরে গিয়ে স্বর্গে এসেছে ?

ব্রেকফাস্ট শেষ করে বেরিয়ে পড়লো দুজনে।

সুশোভন বললো – "আজকে একটু শহরটা ঘুরে দেখে নিই, কি বলো ? কাল সোমবার। সকাল থেকে দৌড়োদৌড়ি শুরু হবে – ইমিগ্রেশনের অফিসে যেতে হবে, তারপর সোস্যাল সিকিউরিটি। বাজার করতে হবে কিছু। তারপর এ্যাপার্টমেন্ট খুঁজতে বেরোতে হবে ... গাড়ী ... ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ... গুচ্ছের কাজ।"

শুচি বললো – "আমার মনে হচ্ছে আমরা যেন একটা সুন্দর ভেকেশনে এসেছি ... কাজের কথা বোলো না এখন প্লিজ। সারাজীবনই তো কাজ করছি।"

সুশোভন হাসলো – "তা বটে ... কিন্তু কাজ না করলে তো আর বসে কেউ খাওয়াবে না, তাও আবার এই দেশে। ... তবে আজ থাক, আজ নাহয় আমরা আমাদের ভেকেশনই enjoy করি!"

কানাডায় পাবলিক ট্র্যান্সপোর্টেশনের ব্যবস্থা খুব ভাল। হোটেল থেকে শহরের ম্যাপ নিয়ে এসেছিলো সুশোভন। সেই ম্যাপ দেখে দেখে ওরা পৌঁছে গেল শহরের মধ্যবর্তী জায়গায় – যাকে এরা বলে "ডাউনটাউন" এখান থেকেই সিটি ট্যুরের বাসগুলো ছাড়ে।

টিকিট কেটে একটা বাসে উঠে বসলো দুজনে।

সুশোভন হাতে টিকিটের ফেরত খুচরো কয়েনগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বললো – "ভাগ্যিস্ এরা খুচরো ফেরত দিতে গিয়ে ঠকায় না! আমি তো এখনো 5 cents আর 25 cents এর তফাতই করতে পারছিনা ... কিন্তু এদের daily lifeএ basic honesty level টা খুব high – দুটো পয়সার জন্য কেউ ছ্যাঁচড়ামি করবে না।"

শুচি তখন জানলার কাঁচে কিশোরী মেয়ের মতো গাল ছুঁইয়ে, তৃষিত চোখে আকাশ দেখছে। অন্যমনস্ক ভাবে বললো – "এতো নীল আকাশ কোথাও কোনোদিন দেখিনি ... আর কত কাছে ... মনে হচ্ছে যেন হাত বাড়িয়ে ছোঁওয়া যায় ..."

সুশোভন হেসে বললো – "Pollution নেই তো, তাই ..."

শুচি গুনগুন করে উঠলো – "এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয় ..."

সুশোভন ব্যস্ত হয়ে উঠলো – "আরে আরে ! আস্তে ... এরা কেউ রবীন্দ্রসঙ্গীতের মর্ম বুঝবে না ... তোমায় কিন্তু পাগল ভাববে !" শুচি ঠোঁট উল্টে বললো – "ভাবুক গে ! চেনে না কি আমায় ? ... কি সুন্দর দেশ এদের ! আর কি পরিষ্কার ঝকঝকে। ..."

সুশোভন বললো – "সৌন্দর্যটা প্রকৃতির দান, তবে পরিষ্কার রাখাটা কিন্তু এদের নিজেদের কৃতিত্ব। ভীষণ পরিশ্রমী জাত এরা – নিজেদের কাজ নিজেরাই করে, আর সবকিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর রাখে। হোটেলের ঐটুকু একটা ছোট পার্কিং লট, সেটার চারপাশটাও কি সুন্দর সাজিয়েছে ফুল দিয়ে। অথচ গরমকাল এখানে খুবই কমসময়ের জন্যে আসে, সেপ্টেম্বর মাস থেকেই সব ফুল শুকিয়ে যাবে – তবু এরা সাজায়। ... আসলে জীবনকে এরা উপভোগ করতে চায় আর উপভোগ করতে জানে।"

শুচি মনে মনে বললো "তাই বোধহয় তুমি আমাকে এখানে এনেছো ... হে ঈশ্বর ... রূপসাগরে ডুব দিতে যে আমার বড়ো সাধ ছিলো !"

(চলবে)

১৯৯০ থেকে আমেরিকা প্রবাসী **ডঃ শকুন্তলা চৌধুরী** কর্মসূত্রে এবং ভ্রমণপ্রিয়তার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন ভাষাকে আপন করে নিলেও, বারবার ফিরে ফিরে আসেন এই বাংলায়, তাঁর মাতৃভাষার কাছে এক পরম ভালোবাসার টানে। ক্লাস ওয়ানে পড়ার সময় স্কুলের পত্রিকায় প্রথম একটি কবিতা প্রকাশ হয়। সেই শুরু, তারপর কলেজ, ইউনিভার্সিটি... প্রবাসের বঙ্গ সম্মেলন এবং আরো নানা পত্রিকায় লেখালেখির ধারাটিকে বজায় রেখেছিলেন, যদিও পেশাগত এবং পারিবারিক ব্যস্ততার কারণে সে ধারাটি ছিল নেহাতই ক্ষীণকায় নদীর মতো। দুই মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার পর, ব্যস্ততা একটু কমতেই ... সাহিত্যচর্চার আপাত শীর্ণ নদীটির মধ্য থেকে ফলগুধারা যেন এসে পড়লো সাগরের মোহনায় ! এই জানুয়ারিতে কলকাতায় প্রকাশিত তাঁর বই "পৃথা" বিদগ্ধ পাঠকমহলে সমাদৃত। ছাত্রজীবন, গোখেল কলেজের অধ্যাপনা, প্রবাসজীবন ও বাস্তব পৃথিবীর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা আলো ফেলে তাঁর লেখায়... সেভাবেই একদিন লেখা হয় 'পরবাসী'।

ধারাবাহিক

প্রতীপ কুমার ভট্টাচার্য

পুরোনো দিনের কথা

পর্ব ৫

আমার বাল্যস্মৃতি – সাত দশক আগে ১৯৪৪-৪৭ সালের কাহিনী

এটি আমার বাল্যস্মৃতি চারণের পঞ্চম অধ্যায়। এগুলি এখন তো খালি ইতিহাসের পাতায় শুষ্ক, নীরস ঘটনা হিসাবেই মুদ্রিত আছে কিন্তু সেই সব যুগান্তকারী, পৃথিবী আবর্তিত ঘটনাবলীর সাক্ষী আমাদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে, কখনও অপরিসীম আনন্দদায়ী, কখনও মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক বেদনার স্মৃতিতে। তারই ফলশ্রুতি সারা পৃথিবীব্যাপী রাজনৈতিক ভূগোলের আমূল পরিবর্তন ও ততোধিক পরিবর্তন মনুষ্যত্ব ও মানবিক মূল্যবোধের।

তখন যুদ্ধের শেষাবস্থা। পরিণাম তখন প্রায় স্থিরই উপলব্ধি করা যাচ্ছিল, বৃটেন-আমেরিকা-রাশিয়ার মিত্রশক্তির কাছে জার্মানি-জাপানের অবশ্যম্ভাবী পরাজয়। জাপান তখনও মরীয়া হয়ে পূর্ব ভূখন্ডে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতের পূর্বপ্রান্তে বর্মা দখল করে তারা ইম্ফল ও কোহিমায় এসে পড়েছে। তাদের লক্ষ্য দিল্লী। সঙ্গে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ। আমরা রুদ্ধশ্বাসে যুদ্ধের খবর শুনতাম, সেইসঙ্গে সুগোপন আজাদ হিন্দ ফৌজের সুগোপন বেতার সম্প্রচার হিন্দিতে, ভারতীয়দের দলে দলে নেতাজীর সেনাবাহিনীতে যোগদান করার জন্য আহবান। তবে এটিই হলো জাপানের শেষ যুদ্ধ, মিত্রশক্তির পরাক্রমে ও খাদ্যাভাবে, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও তাদের বিমান বাহিনীর সহায়তার অভাবে তারা নিস্তেজ হয়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলো। এই সময় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সর্বোচ্চ শক্তিতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে গান্ধীজি ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের নেতৃত্বে। আইন অমান্য, রাস্তা-রেল অবরোধ, বৃটিশ-শাসন ব্যবস্থার সাথে অসহযোগিতা বা non co-operation movement, বিদেশী, বিশেষ করে বিলিতি দ্রব্যাদি ও বস্ত্রাদি ত্যাগ করা, যথাসম্ভব বিদেশী বর্জন করে দেশী জিনিসপত্রের ক্রয় ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা, স্কুল-কলেজ-অফিস-পরিবহন ইত্যাদিকে সাধারণ ধর্মঘট বা হরতালের মাধ্যমে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত। দীর্ঘায়িত যুদ্ধের দরুণ বৃটিশ সাম্রাজ্যের তখন অতি দুরাবস্থা, হীনবল, কোষাগার প্রায় শূন্য, তাদের সর্বশক্তি যুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছে, তখন সর্বোতোভাবে বৈরি, অশান্ত, বিক্ষুব্ধ ৩৩ কোটি ভারতবাসীকে শাসনে রাখা তাদের ক্ষমতার বাইরে। বিশেষ করে ভারতীয় পুলিশ, সমর-বাহিনী ও আমলাদের, যাদের আনুগত্যের ভিত্তির উপর তাদের বল-ভরসা ছিল, সেখানেও অশান্তি মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছে, চরম হলো বোম্বাই এ নৌ-সেনা বিদ্রোহে। বৃটিশ শাসনের শেষাবস্থা ঘনিয়ে এসেছে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল।

ভারতের পূর্ব সীমান্তে জাপানীদের পরাজয়ের পর আজাদ হিন্দ ফৌজের তিনজন বরিষ্ঠ সেনানায়ক, মেজর-জেনারাল শানওয়াজ খান, কর্নেল ধীলন ও কর্নেল প্রেম সেগল কে যুদ্ধবন্দী হিসাবে রাস্ট্রদোহিতার অপরাধে বিচার শুরু হলো দিল্লীর লাল কেল্লায়। কিন্ত জনগনের প্রবল আন্দোলন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষের উৎপত্তি হওয়ায় ও বিশেষতঃ বোম্বাইয়ে নৌবাহিনীর বিদ্রোহে বৃটিশ শাসক প্রমাদ গুনলো, বন্দীদের তারা মুক্তি দিতে বাধ্য হলো। কলকাতায় রসা রোডের এক বাড়ীর ছাদ থেকে আমরা বুকভরা গর্ব ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখলাম কি অসাধারণ ভালোবাসা ও আড়ম্বরের সঙ্গে এক বিপুল জনসমুদ্র নেতাজীর সঙ্গী এই তিন নির্ভীক যোদ্ধাকে একটি লরীর ওপর আরোহণ করিয়ে শহরের পথ পরিক্রমা করছে। চিন্তা করে শিহরিত হলাম যে কয়েকদিন আগেও এঁরা নেতাজীর পাশে দাঁড়িয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন ভয়ঙ্কর বিপদসংকুল অরণ্যের মধ্যে, শারীরিক পীড়ন ও অপ্রতুল আহারের কষ্ট অগ্রাহ্য করে, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে। চারিদিক থেকে মহিলাদের শঙ্খধ্বনি, পুষ্পাঞ্জলী, গোলাপজল নিক্ষেপ, মিষ্টান্ন বিতরণ ... সে আবেগ, উচ্ছাস চিরকাল আমার স্মৃতির মণিকোঠায় সঞ্চিত হয়ে থাকবে। বিশেষ করে এর কিছুদিন আগেই বজ্রপাতের মতো নেতাজীর

বিমান দুর্ঘটনায় তিরোধানের সংবাদ এসেছে, সেই অসীম বেদনার মধ্যে তাঁর এই ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধাদের দর্শনে যেন তাঁরই উপস্থিতি মনে প্রাণে অনুভব করা গেল।

পশ্চিম দুনিয়ায় যুদ্ধের অবসান হলো। বাবা জামশেদপুরে মিলিটারি হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন, তিনি কলকাতার কমান্ড হাসপাতালে বদলী হলেন, আমরা যুদ্ধশেষের দিনটিতেই রাতের ট্রেনে কলকাতায় ফিরলাম। ঐ ট্রেনেই বৃটিশ ও আমেরিকান সেনাদের একটি বিরাট দল কলকাতায় ফিরছিল, সারা রাস্তা তাদের মদোন্মত্ত উল্লাস ও হৈ-হুল্লোড়ে আমাদের দুচোখের পাতা এক করা গেল না। বাবা বুঝিয়ে বললেন যে বহুদিন তারা দেশ ছাড়া, এখানে যুদ্ধক্ষেত্রে অবর্ণনীয় কষ্ট ও প্রতিপদে প্রাণের আশংকার পর বিপন্মুক্তি ও দেশে ফিরে আবার আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশার আনন্দে তারা আত্মহারা!

আশ্বিন মাস। যে সময়ের জন্য বাঙ্গালীরা সারা বছর অধীর আগ্রহের সঙ্গে উন্মুখ হয়ে থাকে, মহামায়ার পুজোর আনন্দোৎসব পালন করার জন্য। তখন বারোয়ারি পুজো হতো মুষ্টিমেয়, শ্যামপুকুর, বাগবাজার, সিমলা ব্যায়াম সমিতি, ভবানীপুরের সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভা ইত্যাদি। আসল আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ পুজো হত বিত্তশালী গৃহে, সাবর্ণ রায়চৌধুরি, শোভাবাজার রাজবাড়ী, মল্লিক বাড়ী, হাটখোলা দত্তবাড়ী ও অন্য কয়েকটি বিশিষ্ট ধনবান পরিবারের ভবনে। অবশ্য দেবীর সব মন্দিরেই পূজার্থীদের ভীড় উপচে পড়তো। আমার দাদামশায়ের তাঁর গ্রামে একটি বড় বাড়ী ছিল, সেটি সারাবছর জনশূন্য হয়ে থাকলেও পুজোর মাসটি গম্ গম্ করতো। দাদামশায় হাইকোর্টের নামজাদা বরিষ্ঠ উকিল ছিলেন, ছাত্রজীবনে বহু সম্মানের অধিকারী হয়ে বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইংরেজ জর্জরাও তাঁর ওকালতি জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা ও মেধার জন্য তাঁকে মান্য করে চলতেন। সারা বছর জটিল মামলা-মকর্দমা চালনায় পরিশ্রম করে এই সময়টি ছিল তাঁর প্রিয় অবসরের। অতি নিষ্ঠাভরে ও সুষ্ঠুভাবে তিনি প্রতি বছর এই দেশের বাড়ীতে দূর্গাপূজা সম্পন্ন করতেন, অহেতুক আড়ম্বরহীন হয়েও সেটি বিশালাকার ধারণ করতো। কারণ তাঁর নিজস্ব পরিবার ছিল বৃহৎ, দুই পুত্র, আট বিবাহিতা কন্যা ... অর্থাৎ আমার মা-মাসীমারা ... ও জনা কুড়ি নাতি-নাতনি। এ ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও দেশের পাড়া প্রতিবেশি শুদ্ধ বাড়ীটি এক মেলাপ্রাঙ্গনের আকার ধারণ করতো। হৈ-হল্লা, হাসি-ঠাট্টা, গান-বাজনায়, আর পুজো অনুষ্ঠান সম্পর্কিত নানা কাজে দিনগুলি যেন ঝড়ের বেগে এক মধুর স্বপ্নের মতো অতিবাহিত হয়ে যেত। হায় রে আমার নানা রংএর হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি!

পুজোর আনন্দ অবশ্য শুরু হতো কলকাতাতে মহালয়ার দিন থেকেই। স্কুলে ছুটি পড়ে গেছে, অতএব নিশ্চিন্ত, নির্ভাবনার দিন। নতুন জামা-কাপড়-জুতো কেনা হয়েছে, আমরা আলহাদে আটখানা! কত রকম খাওয়া-দাওয়া, যে সব আত্মীয়স্বজন দূরে দূরে থাকেন তাঁরাও পূজা উপলক্ষে সমাবেত হয়েছেন, মিলনানন্দে হাসি-ঠাট্টা-চিৎকার-চেঁচামেচিতে বাড়ী সরগরম! সর্বোপরি হাতে নতুন ঝকঝকে সুপুষ্ট পূজাবার্ষিকীখানি – আহা কি সব তাদের মন-ভরানো নাম, চিত্রদীপ, রূপরেখা, সোনালী ফসল, বর্ষ মঙ্গল! কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, জসীমুদ্দিন, সুনির্মল বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, কামাখ্যাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়. হেমেন্দ্র কুমার রায়, আরো কতজনের গল্প-কবিতা পড়ে পড়ে আমাদের আশ মিটতো না!

কাকভোরে দাদামশায় ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিতেন, আশ্বিন মাসের ঈষৎ গা শির শির করার আধঘুমের মিষ্টি আমেজে শোনা হতো বেতারে শঙ্খ-মঙ্গল ধ্বনি ও তারপরেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত কণ্ঠে মাতৃ আহবান। পঙ্কজ মল্লিকের অপ্রতিম সুরে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে জাগো দূর্গা দশপ্রহরণধারিণী জাগো, ও তারপর বাঙ্গালীদের সেই চিরপ্রিয় ... বাজলো তোমার আলোর বেণু, সুপ্রীতি ঘোষের সুললিত কণ্ঠে। স্তবপাঠের প্রতিটি চরণ ও সেই নমস্তস্যৈ নমোঃ নমো, সে তো এখনো বাঙ্গালীদের প্রাণের জিনিস ! তখন এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি প্রচারিত হতো, অর্থাৎ ভোররাত্রিতেই শিল্পীদের গৃহে গৃহে গাড়ী পাঠিয়ে তাঁদের বেতার ভবনে আনা হতো, পুরো অনুষ্ঠানটি তখনই সম্প্রচার হতো। রেকর্ডিং করে সম্প্রচার শুরু হয়েছে ষাটের দশকে।

গ্রামে যাওয়া হতো সদলবলে চতুর্থীর দিনে। যে সব মাসীমারা অন্য প্রদেশে থাকতেন স্বামীর কর্মক্ষেত্রে তাঁরাও নিতান্ত বাধা না পড়লে সবাই পিত্রালয়ে জমায়েত হতেন এই সময়ে। দশ ভাই-বোন, ও তাঁদের প্রায় ডজন দুয়েক পুত্র-কন্যার সমাবেশে যে আমোদ-উল্লাসের ঢেউ বয়ে যেত তা এখন চিন্তা করলেও যেন অবাস্তব, গল্পকথা মনে হয়। যাওয়া হতো লক্ষীকান্তপুর লোকালে, গন্তব্যস্থল জয়নগর-মজিলপুর। ভোরবেলাতেই গৃহকর্মীদের কয়েকজন শিয়ালদহ ষ্টেশনে রওয়ানা হতো, তারা একটি কামরা দখল করে রাখতো আমাদের পরিবারবর্গের জন্য। সেই কামরায় আমাদের পুরো দলটির স্থান সংকুলান হয়ে যেত। বেঞ্চে সবার জায়গা হতো না, প্রশস্ত মেঝের ওপর বড় বড় মাদুর-শীতলপাটি পেতে দেওয়া হতো, ছোটরা তার উপর বসে দিব্যি মজা করে চলে যেতাম। সবার সমবেত কণ্ঠে আগমনী গান, তখন পূজার ঠিক আগেই নানা খ্যাত-অখ্যাত গায়কের আগমনী গানের গ্রামাফোনের রেকর্ড বেরোতো। এ ছাড়া আমরা গ্রাম্যকবির সব আগমনী গান গাইতুম, অতি সহজ, সরল, কথ্য ভাষায় মাতৃ আহবান ... মা, কৈলাস থেকে এসেছো, সেখানে তো আমোদ-প্রমোদের কিছুই নেই, আমরা এখানে রাজার দুই নাতিকে ইংরাজি শিখাবো, গড়ের মাঠে গোরাদের বাদ্যি শোনাবো (ইংরাজ সেনার ব্যান্ড, প্রতি রবিবার সেটি শোনার জন্য প্রচুর জনসমাগম হতো), মটরে চড়াবো, সেখানে তো শিবের বলদ বাহনই ভরসা ! সেখানে সন্দেশ, মিহিদানা, গজা কিছুই পাওয়া যায় না, এখানে তারা পেট ভরা খেয়ে যান! হৈ-হুল্লোড় করে দেড় ঘন্টা সময় যেন পলক ফেলতেই কেটে যেত। বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিত রেলগাড়ীটির তখন এইরকম সময়ই লাগতো।

ষষ্ঠীর বোধন থেকেই পুরোদমে পুজোর আনন্দ ও কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে যেত। পূজামন্ডপে গ্রামের কারিগরের গড়া প্রতিমা এক অপূর্ব মহিমান্বিত শোভায় আসর জাঁকিয়ে আছেন, "ডাকের সাজ" ... অর্থাৎ রূপোলি ও জরির পাতের অলঙ্কার সজ্জিত ... ঝলমলে প্রতিমাকে দেখে চোখ ফেরানো যেত না, বড় বড় পেট্রোম্যাক্স আলোয় মন্ডপ যেন এক রূপকথার দেশে পরিণত হয়েছে। সেই বছরে, ১৯৪৫ সালে যুদ্ধশেষে আমেরিকান সৈন্য ডিসপোসালের গুদাম থেকে কেনা এক পেট্রোল জেনারেটর প্রথম স্থাপন করা হলো ঐ বাড়ীর প্রাঙ্গনে একটি চালাঘরে। বাঁশের খুঁটি পুতে, তার ঝুলিয়ে সেই গৃহে সর্বপ্রথম বৈদুতিক আলো প্রবেশ করলো। পুজোমন্ডপ সংলগ্ন বারান্ডার ছাদে একটি ছোট পাখাও লাগানো হলো, দাদামশায় ও অন্যান্য বয়োজেষ্ঠ্য ব্যক্তিদের জন্য। বেশি শক্তির ইলেকট্রিক আলোয় প্রতিমা এক চোখ-ঝলসানো শোভায় দৃশ্যমান হলেন!

তারপর পুজোর প্রতিদিন সকালে নিকটবর্তী পুকুরে স্নান, অঞ্জলীর পর প্রসাদ ভক্ষণ ও অগণিত ডাবের জল পান। গাছে গাছে দু'তিন জনকে আরোহণ করানো হয়েছে, তারা কাঁদি কাঁদি ডাব কেটে আমাদেরও পিপাসা মেটাচ্ছে। অতঃপর লুচি, আলু চড়চড়ি, মিহিদানা ও সর্বশেষে পৃথিবী বিখ্যাত জয়নগরের মোয়া দিয়ে ক্ষুধার তৃপ্তি!

১৯৪৩ এর মন্বন্তর থেকেই দাদামশায় দরিদ্রনারায়ণ ভোজন শুরু করেছিলেন। প্রশস্ত প্রাঙ্গনে মাটিতে সারি সারি কলাপাতা, মাটির গেলাস পেতে শত শত বুভূক্ষিত মানুষকে খাওয়ানো, সে এক হৃদয়গ্রাহী মহাযজ্ঞের দৃশ্য! কয়েকটি চালাঘর বাঁধা হতো, ভেতরে মাদুরের উপরে গামলা গামলা বাসনে গরম ভাত প্রস্তুত হয়ে পাহাড়ের মতো স্তুপীকৃত করা হচ্ছে, চৌবাচ্চাকার বাসনে বালতি বালতি ডাল, পাঁচমিশালি চড়চড়ি, অম্বল ও সুজির পায়েস। ভোজন শুরু হতো বেলা একটা নাগাদ, তিন চারটি ব্যাচে, এক এক বারে কুড়ি পঁচিশ জনের ছটি পংক্তি। বাড়ীর ও পাড়ার প্রতিবেশী পুরুষরাই পরিবেশন করতেন। আমরা অর্থাৎ ছোটদের ওপর ভার ছিল পরিবেশনের বালতি শূন্য হয়ে চালাঘরে আসা মাত্রই সেগুলি হাতা ভর্তি ভাত, ডাল ইত্যাদি দিয়ে আবার পূর্ণ করে দেওয়া। সব শেষ হতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতো, সারা দিনের সেই অমানুষিক পরিশ্রমের পর আমরা হুল্লোড় করে পুকুরে স্নান করতে যেতাম, রাত্রে পেট্রোম্যাক্সের আলোয় পুকুরে সেই অবগাহনের তৃপ্তি চিরকাল স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে থাকবে !

অষ্টমীর দিনের প্রধান আকর্ষণ সন্ধিপুজো। গভীর রাত্রে অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণ, সেই পবিত্র ক্ষণটি ঘোষণা করতে আমার বড় মামা দাদামশায়ের দোনলা বন্দুকটি আকাশের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লেন ... অবশ্য ফাঁকা কার্তুজ, দুম দুম

আওয়াজ, সঙ্গে সঙ্গে ঢাকীর দল প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের বাদ্যযন্ত্রের উপর, বেজে উঠলো শঙ্খ-কাঁসর-ঘন্টা, কানে তালাধরানো আওয়াজ, আর পুরোহিত মহাশয়ের আবেগপূর্ণ আরতি, আমরা তখন সব তন্ময় হয়ে দর্শন করছি। সারা আকাশ-বাতাস যেন এক অপার্থিব পবিত্র আবেশে পূর্ণ, ভক্তিভরে সবারই মনে মনে অনুচ্চারিত, মা, দয়াময়ী মা ... সর্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে ...।

নবমী থেকেই মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকতো, আশু বিদায়ের বিষাদে। আগমনীর গান বেরিয়েছে ... যেও না, যেও না নবমী নিশিগো, দাঁড়াও করুণা করে ! দশমীর দিনে শেষ অঞ্জলী, সিন্দুর খেলা, তারপরেই একটু দূরে বড় পুকুরে দেবীর বিসর্জন। সবার মনে আকুল প্রার্থনা, সামনের বছর আবার এসো মা!

আজ এখানেই ইতি করি। এর পরের পর্বটি কলকাতার ইতিহাসের এক পরম দুঃখ ও বেদনাময় অধ্যায়ের কাহিনী ও তৎপরে সেই বহু আকাঙ্খিত, বহু আরাধ্য ভারতের স্বাধীনতা লাভ।

(ক্রমশঃ)

প্রতীপ কুমার ভট্টাচার্য – (বয়স – ৮৪+) তৎকালীন মাইশোর প্রদেশে ইউরোপীয়ান হাই স্কুলের পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান প্রাপ্তির পর যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী পাস (১৯৫৪-৫৮)। তৎপরে একটি আড়াই-বছরব্যাপী মর্যাদাপূর্ণ ট্রেনিং কোর্স ইংল্যান্ডের ম্যানচেষ্টারে এ.ই.আই কোম্পানীতে। সিইএসসি তে একাদিক্রমে ৩৪ বছর কর্মের পর ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার পদ থেকে অবসর গ্রহণ (১৯৯৭)। অবসর জীবনে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা, বই পড়া, ফটোগ্রাফী, ও ফেসবুক, ট্যুইটার ইত্যাদির মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করা ও ইদানীং বাংলা ও ইংরাজিতে পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ ও অন্যান্য সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত রম্য-রচনা লেখায় ব্যাপৃত।

প্রশান্ত চ্যাটার্জী

সংরুর থেকে আম্বালা হয়ে চক্রতা-দিল্লী – Establishment 22

পর্ব ৯

চিরকালই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সবচেয়ে বড় বলি হন উলুখাগড়ারাই। যুদ্ধে যেমন সীমান্তের আশেপাশের বাসিন্দারা। পাশের পাড়ার ছোট্টবেলার খেলার সাথীকে রাতারাতি বিদেশী তকমা লাগিয়ে নিষেধের বেড়া দিয়ে আড়াল করে দেওয়া হয়। বা সহস্র সম্ভাবনাময় একদল যুবককে হঠাৎই মারা পড়তে হয় যারা হয়তো কেবল পরিবারকে একটু ভাল রাখবে বলে অন্য উপায় না পেয়ে সেনাবাহিনীতে কেবল চাকরি করতে এসেছিল। ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের এই দ্বিতীয় রকম উলুখাগড়ার দলেই একজন ছিলেন প্রশান্ত চ্যাটার্জী। যিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে ফিরেছিলেন। তাঁর সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক প্রকাশ এই উলুখাগড়ার দিনলিপি। আজ নবম পর্ব।

সিক্সটিন ক্যাভিলারিতে ছ'বছর ছিলাম। ওই সময় আবার বিগ্রেড টুর্নামেন্ট হল। সেখানে টিমে সুযোগ পেয়েছিলাম। তারপর আবার ডিভিশন টুর্নামেন্ট আরম্ভ হল। আমাদের ইউনিট থেকে তিনজন টিমে সুযোগ পেয়েছিলাম। আম্বালায় একটা গোর্খা রেজিমেন্টে আমাদের যুক্ত করে দিল। মনে আছে ইউনিটের নাম সিক্স বাই ইলেভেন জি আর। ওখানে আমাদের কাজ সকালে বিকালে খেলা আর বিশ্রাম করা। রাতে ঘুরতে যেতাম। আম্বালায় ডিভিশন টুর্নামেন্ট শেষ হবার পর আমরা নর্দান কমেন্ট টুর্নামেন্টের জন্য চলে গেলাম উধমপুর। ঐ টুর্নামেন্টে আমার আগে যে ছবি তোলা হয়েছিল, সেটা এখন আমার বাড়ির অ্যালবামে আছে। ওই টুর্নামেন্টে আমরা হেরে যাই।

টুর্নামেন্ট শেষ হলে ফিরে এলাম আবার সংরুরে। আবার ড্রিল, পিটি, ওয়ার্কশপ, ট্যাঙ্ক-এর ওয়ারলেস সেট দেখা, প্রয়োজনে রিপেয়ার করা, আর কখনো কখনো এক্সারসাইজে যাওয়া – এইভাবে চলছিল। সিক্সটিন ক্যাভিলারিতে থাকার সময় পাঞ্জাব প্রায় পুরোটাই ঘুরে নিয়েছি। অনেকদিন হয়ে গেছে এই ইউনিটে। সাধারণ ভাবে তিন বছর অন্তর পোস্টিং হয়ে যায়, কিন্তু খেলার সাথে জড়িত থাকার জন্য আমার পোস্টিং হচ্ছিল না। একদিন সিগনাল ওসিকে ইন্টারভিউ দিয়ে অন্য জায়গায় পোস্টিং-এর জন্য বললাম। বললাম যে, আমার ছ'বছর হয়ে গেছে। এই ইউনিটে যে ওয়্যারলেস সেট আছে ওটা বাদ দিয়ে অন্য কোন সেটের কাজ আমি জানি না। আমাকে সে সুযোগটা দেওয়া হোক। এবার অন্য কোন ইউনিটে যাওয়ার পালা। দেখা যাক কোথায় এবং কোন ইউনিটে পোস্টিং হয়। কিছুদিন অপেক্ষা করার পর পোস্টিং হল Establishment-22 (EST-22) তে। ১৯৭৪ সালে জানুয়ারি মাসে জব্বলপুর থেকে RM CLI করে এলাম। কিছুদিনের মধ্যেই খবর পেলাম আমার পোস্টিং EST 22 তে হয়ে গেছে। আর আমাকে এপ্রিল এর প্রথম সপ্তাহে মৌ থেকে ওখানে চলে যেতে হবে। এর মধ্যে ছোটদার কাছ থেকে চিঠি পেলাম বুবুর বিয়ে মার্চ মাসে ঠিক হয়ে গেছে আর আমাকে যেভাবেই হোক বাড়ি যেতে হবে। অ্যানুয়াল লিভের চেষ্টা করলাম। কিন্তু পোস্টিং এর জন্য অনুয়াল লিভ পেলাম না। ক্যাসুয়াল লিভ এর চেষ্টা করেও পেলাম না। বাধ্য হয়ে পার্ট অফ অ্যানুয়াল লিভ মাত্র দশ দিন নিয়ে বাড়ি গেলাম। ছুটি শেষ করে মৌ তে ফিরে এসেও ভালো লাগছিলো না। কোনো রকমে দিন শেষ করে এপ্রিল এর পাঁচ তারিখে EST 22-র মুভমেন্ট অর্ডার নিলাম। ছয়দিনের ব্রেক জার্নি পেয়েছিলাম। কিন্তু কোথায় যাবো? বাধ্য হয়ে চারদিন মৌ তেই কাটালাম। তারপর নতুন জায়গার জন্য বের হলাম।

EST-22-এর হেডকোয়ার্টার চক্রতাতে, হোম মিনিস্ট্রির আন্ডারে। ওখানে পোস্টিং-এর কতগুলো শর্ত ছিল। মুসলমান হলে চলবে না, নিজের ট্রেডে ক্লাস ওয়ান হওয়া চাই, এসিআর-এ কোন রেড এন্ট্রি থাকলে চলবে না। চাকরি জীবনে আমার কোনো শাস্তি হয়নি, ছিল না কোন লাল কালি । যেতে গেলে দেরাদুন থেকে আট ঘণ্টা পাহাড়ি রাস্তা পেরিয়ে যেতে হবে। ওই রাস্তাটা যাওয়ার জন্য তখন গেট সিস্টেম ছিল। এখন হয়তো কিছু পরিবর্তন হয়েছে। কয়েকদিন অপেক্ষার পর চক্রতা

যাবার মুভমেন্ট অর্ডার হাতে ধরিয়ে দিল। নিয়ম আছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পোস্টিং হলে আটদিনের ব্রেক জার্নি পাওয়া যায়। অত জিনিস নিয়ে মাত্র আট দিনের জন্য বাড়ি আর গেলাম না। কয়েকদিন ওখানেই কাটিয়ে দিলাম, তারপর একদিন সবকিছু নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দেরাদুনের উদ্দেশ্যে।

EST-22-এর একটা ট্রানজিট ক্যাম্প দেরাদুনে। ওখানেই প্রথম রিপোর্ট করার নিয়ম। ওরা সুবিধামতো মিলিটারি ট্রাকে চক্রতা পাঠিয়ে দেয়। এই নিয়ম মেনে ক্যাম্পে রিপোর্ট করে দিলাম। নতুন জায়গায় নতুন কাজের পদ্ধতি কেমন হবে সেসব ব্যাপারে একটু চিন্তায় আছি। ট্রানজিট ক্যাম্পে কোন কাজ নেই। দু-তিন দিনের মধ্যে চক্রতায় পাঠাবে বলে মনে হয়। ইলেভেন কর্পস সিগন্যাল রেজিমেন্ট থেকে একজন অপারেটর-ও এই ক্যাম্পে রিপোর্ট করেছে, সেও একই জায়গায় যাবে, তার সাথে আলাপ হল। কেরালাতে বাড়ি, সম্ভবতঃ ওর নাম ছিল ওহাব। দেরাদুন পৌঁছে রাতটা স্টেশনেই কাটাতে হলো। পরের দিন EST -22 -এর ট্রানসিট ক্যাম্পে রিপোর্ট করার পর জানলাম, আগামীকাল EST -22 -এর জন্য একটা গাড়ি যাবে। ঐদিন রাতে দেরাদুন শহর একটু ঘুরে এসে শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে স্নান করে, খেয়ে সিগন্যাল কোম্পানির জন্য গাড়িতে উঠে বসলাম। পাহাড়ের উপরে চক্রতা। সেজন্য সকলেই বলে 'উপরে' যেতে হবে। চক্রতা সম্ভবত ৯০০০ ফুট উঁচু, বরফ পড়ে শুনেছি। আমরা মিলিটারি ট্রাকে চড়ে বসলাম। আট-ন ঘন্টা রাস্তা, পৌঁছতে পৌঁছতে রাত্রি হয়ে যাবে। দুটোর সময় দেরাদুন ছেড়ে দিলাম। এর আগে কোনদিন পাহাড়ি এলাকায় চাকরি করি নি। এরকম রাস্তায় এর আগে কোনদিন আসা-যাওয়া করিনি। ওখানে যাওয়ার জন্য গেট সিস্টেম আছে। একদিক থেকে গাড়ি যাবে, শেষ গাড়ি গেটে টোকেন দিলে তবে অন্যদিক থেকে গাড়ি ছাড়বে, এরকমই ব্যবস্থা। রাস্তায় যাওয়ার সময় গাড়ি থেকে একবার নিচে তাকালে মনে হয় এখনই বোধহয় গাড়ি নিচে চলে যাবে। আমরা আর কেউ বাঁচব না। খুব ভয় লাগছিল। শুধু মনে হচ্ছে, কি করে এখানে চাকরি করব। আমার সাথে 'ওহাব' বলে যে ছেলেটি ছিল, সে খালি বলছে, "আমি এখানে কোনমতেই চাকরি করব না।" এইভাবে গাড়ি ক্রমশ চক্রতার দিকে এগোতে থাকল। যাওয়ার পথে 'কালসি' বলে একটা জায়গা আছে। অদ্ভুত ব্যাপার, কালসির আগে পর্যন্ত গায়ে সাধারণ জামা ছিল, যেই কালসি পৌঁছালাম – বেশ ভালোরকম ঠান্ডা লাগতে লাগল। দেরাদুন থেকে কালসি পর্যন্ত এরকম, আবার ওখান থেকে চক্রতা পর্যন্ত অন্যরকম। ওহাব খুব গম্ভীর হয়ে গেছে, কোন কথাই বলছে না। একেবারে চুপচাপ।

EST -22 র সিগন্যাল কোম্পানি দেরাদুন থেকে ১১০ কিলোমিটার দূরে চক্রতায়। দেরাদুন থেকে কালসি পর্যন্ত খুব একটা অসুবিধা হলো না। কিন্তু কালসি থেকে সঁইয়া এবং সঁইয়া থেকে চক্রতার রাস্তায় জীবন হাতে করে যেতে হলো। যেকোনো সময় যেকোনো বিপদ হতে পারে। ক্রমশ গাড়ি ছোট রাস্তা দিয়ে পাহাড়ের উপর উঠতে লাগলো। নিচের দিকে তাকালে বেশ ভয় করছে। এখানে রাস্তা সরু তাই গেট সিস্টেম আছে। যাতে কোনো এক্সিডেন্ট না হয়। কালসি থেকে যতক্ষণ না সমস্ত গাড়ি সঁইয়া পৌঁছচ্ছে ততক্ষণ সঁইয়া থেকে কোনো গাড়ি কালসির দিকে ছাড়বে না। আর ওইভাবেই সঁইয়া আর চক্রতার মধ্যে গাড়ি চলাচল করে। প্রায় ৯০০০ ফুট ওপরে চক্রতায় এপ্রিল মাসে যে ওরকম ঠান্ডা হতে পারে এর আগে আমার ধারণা ছিল না। পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। চক্রতা বাজার পেরোনোর পর 'রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া' আরম্ভ হয়ে গেল। ওখানে সাধারণের যাওয়া নিষেধ। যেতে হলে অনুমতি লাগবে। এবার আমরা এস্টাবলিশমেন্ট ২২-এ পৌঁছে গেলাম। ট্রাক থেকে নামার পর আমাদের জিনিসপত্র ওখানকার এম.টি. গ্যারাজে রাখা হল। আমাদের বলা হল, হালকা জিনিস নিয়ে উপরে উঠে যেতে। ভারী বাক্স এখানেই থাক, আগামীকাল সকালে নিয়ে যাবে। D সেক্টরের এক সর্দারজি রাস্তা দেখিয়ে MT থেকে কোম্পানি পর্যন্ত নিয়ে গেল। MT থেকে কোম্পানি এতটাই ওপরে বিছানা বা সুটকেস নিয়েও ওঠা যে কি কষ্টকর সে আমিই জানি। বাধ্য হয়ে বড় বাক্সটা নিচেই ছেড়ে গেলাম সেরাত্রির জন্য। সিঁড়ি দিয়ে আমাদের ব্যারাকে পৌঁছে গেলাম। যাওয়ার সাথে সাথেই আমাদের বলা হল, তাড়াতাড়ি মেসে চলে যাও, না হলে খাবার শেষ হয়ে যাবে। আমার বিছানাপত্র মেকানিক্স সেকশনে রাখতে বলল, ওহাবকে অপারেটর সেকশনে পাঠিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি মেসে চলে গেলাম। সেদিন 'মিট ডে' ছিল। মাংস রুটি নিয়ে খেতে বসে গেলাম। খুব খিদে পেয়ে গেছিল। ভালোভাবে খেয়ে ব্যারাকে চলে এলাম। এখানে এখন মোটামুটি ঠান্ডা আছে। সকলেই এসে আলাপ করল, নতুন গেছি। আমার মধ্যে একটু জড়তা

আছে। মেসে ওহাবের সাথে দেখা হলো না কখন খেতে এল কে জানে। আগামীকাল সকালে দেখা হবে। বিছানা করে কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। সকালে উঠে গ্যারেজ থেকে বড় বাক্সটা নিয়ে আসতে হবে। সেরাত্রে দুখানা কম্বল নিতে হলো ঠান্ডার জন্য।

পরদিন বড়ুয়া, যে আমার সাথে CLI করেছিল জব্বলপুরে, তার সাথে দেখা হলো। সেও আমার একই সেক্টরে পোস্টেড। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নিয়মমত ফল-ইন হলাম। মেকানিক সেকশনের ইনচার্জকে বললাম আমার কিছু জিনিস নিচে গ্যারেজে আছে, সেটা আনতে হবে। আমার সাথে আরো একজনকে দিল, দুজনে মিলে যেন নিয়ে আসি। নাথ ও আমি MT তে গিয়ে বড় বাক্সটা নিয়ে এলাম। আমি ওহাবের খোঁজ নিলাম। কারণ ওহাবকে ফল-ইন এ দেখতে পাইনি। পরে জানলাম, খুব ভোরবেলা ওহাবকে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে তার পুরনো ইউনিটে ফিরিয়ে দিয়েছে। একদিক থেকে ছেলেটার ভালই হল। ও এই রকম জায়গায় চাকরি করতে চাইছিল না। সেটা গতকালই রাস্তায় আসার সময় অনেকবার বলেছিল। এবার ওকে ফিরিয়ে দেওয়ার কারণটা বলা যাক। ওহাব মুসলমান ছিল। মুসলমানদের পোস্টিং এখানে করা হয় না, কোন শাস্তি পাওয়া লোককে পোস্টিং করা হয় না। সব ব্যাপারে "এ" হওয়া চাই। ওহাব ইলেভেন কর্পস সিগন্যাল রেজিমেন্ট থেকে এখানে এসেছিল। সেই জন্য ইলেভেন কর্পস সিগনাল রেজিমেন্টকে চিঠি দিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল, কেন ওহাবকে এখানে পোস্টিং দেওয়া হয়েছিল ?

আমার বাক্স আনার জন্য সকালে যখন নিচে গেলাম, দেখলাম গ্যারেজের পাশে বেশ বড় ফুটবল গ্রাউন্ড আছে। পাশে বাস্কেটবল ও ভলিবল গ্রাউন্ডও আছে। ফুটবল গ্রাউন্ড দেখে মনটা বেশ ভালো হয়ে গেল। বাক্স রেখে একটু নিচে সিগনাল সেন্টারে চলে গেলাম। ওখানে আমাদের ওর্য়াকশপ, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আর অপারেটর রুম আছে। একেবারে শেষে 'F of S'-এর অফিস। চক্রতার চাকরি শুরু হলো। EST -22 -র কাজের ব্যাপারে মোটামুটি জানলাম। ওই EST-22 তে তিব্বতি, বাংলাদেশ ও আফ্রিকার কিছু ট্রেনিকে ট্রেনিং দেওয়া হতো এবং সেটা অত্যন্ত গোপন ভাবে। প্রথম কাজ তিব্বতিদের ট্রেনিং দেওয়া যাতে ওরা চীনের কাছ থেকে স্বাধীনতা পায়। দ্বিতীয় কাজ বাংলাদেশ মিলিটারিকে ট্রেনিং দেওয়া যাতে ওরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়তে পারে। ওদের ট্রেনিং স্কুল টান্ডোয়া বলে একটা জায়গায় আছে। চক্রতা থেকে ১২-১৩ কিলোমিটার নিচে। তিব্বতিদের ট্রেনিং HQ চক্রতায়। তৃতীয় কাজ বেলুচিদের ট্রেনিং দেওয়া ওদের ট্রেনিং স্কুল ফুরতি ক্যাম্প। যেটা কালসিতে। EST -22-র চারটে সেক্টর আছে। এ সেক্টর লেহ তে , বি সেক্টর সিমলা থেকে ২৭৫ কিলোমিটার ওপরে মস্তরং বলে একটা জায়গায়। ওখানে যেতে হলে কারছিম পর্যন্ত বাস যায়। কারছিম থেকে মস্তরং ৩৯ কিলোমিটার। যখন বরফ না থাকে তখন কারছিম থেকে খুরলা পর্যন্ত গাড়ি যায়। আর খুরলা থেকে মস্তরং সবসময়েই হাঁটাপথ। সেক্টর সি হলো হৃষিকেশের আগে গোচারে। আর ডি সেক্টর আসামের ডুমডুমায়। এস্টাবলিশমেন্ট ২২-এর হেডকোয়ার্টার চক্রতাতে। দিল্লিতে একটা ডিটাচমেন্ট আছে, সেটা DGS (Director General of Security) এর আন্ডারে। ওখানে ITBP আর RAW ও DGS এর আন্ডারে ছিল। এছাড়া দেরাদুন আর চক্রতার মাঝামাঝি কালসিতে আরও একটা ইউনিট আছে, সেখানে বাংলাদেশের সমস্ত ছাত্ররা ট্রেনিং করত। একটা বিরাট হল আছে কলসিতে, তাতে মুজিবর রহমানের বড় একটা ছবি লাগানো ছিল। বাংলাদেশের ছাত্রের জন্য ট্রেনিং-এ যা খরচ হত তার ৩০% বাংলাদেশ ও ৭০% ভারত দিত। আমাদের লোকেরা, বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছে তাদের ট্রেনিং দিত। তাদের সব দায়িত্ব আমাদের ছিল। আর্মস, আম্মুনেশন, ওয়্যারলেস সেট – এমন অন্যান্য সব জিনিস আমাদের দিতে হত। ম্যান-পাওয়ার তো অবশ্যই ভারতের ছিল। চক্রতা থেকে কালসীতে আমায় মাঝে মাঝে যেতে হত। বাংলাদেশ ছাত্রদের পাস আউট প্যারেডেও যেতে হত। বাঙালি হওয়ার জন্য, ভাষা এক হবার জন্য আমাকে অনেকবার পাঠানো হতো ওখানে। প্রতিবারই আমাকে বিশেষভাবে সাবধান করে দেওয়া হত, কোনভাবেই ওখানে রাজনীতি নিয়ে যেন কোন আলোচনা না করি। এত সাবধান করা সত্ত্বেও একদিন একটু গরম আলোচনায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। আগে একটা সিনেমা পত্রিকা বেরোত – 'উল্টোরথ'। একদিন ওখানে কাজে গিয়ে অফ সময়ে উল্টোরথ পড়ছি, একজন এসে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি বাঙালি ?" তারপর নানা কথার পর আমি প্রচন্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলাম। কারণ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ অপারেশনের সময় ওরা মানে বাংলাদেশ নাগরিকরা বিভিন্ন জায়গায়

পোস্টার লাগিয়েছিল "Indian Army Quit Bangladesh." যে ভারতের জন্য স্বাধীনতা পেয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে পোস্টার মেরেছিল। ওরা ভয় পেয়েছিল, ভারতীয়রা হয়ত বাংলাদেশ ছাড়বেনা। ওরা সেদিন আমায় বলেছিল, "যারা পোস্টার মেরেছিল, তারা বাংলাদেশের ভালো চায় না। আমরা স্বীকার করছি আপনাদের জন্য আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।"

কয়েকদিন চক্রতায় থাকার পর হঠাৎ আমায় বললে, দিল্লি যেতে হবে। ওখানে একটা ডিটাচমেন্ট আছে। সেখানে মাত্র দুইজন RM থাকে। প্রথমে আমি আপত্তি করেছিলাম। পরে জানলাম ওখানে বড় মজার চাকরি। কোনো অসুবিধা হলে এখানে log দিও। দিল্লি পৌঁছালাম। ওটা পালাম এয়ারপোর্টের কাছে 'মোর লাইন' বলে একটা জায়গা ছিল সেখানে। আমাদের সিগন্যালের মোট ছয়-সাতজন থাকতাম। বাকি সবাই তিব্বতি। পালাম এয়ারপোর্টের একদম কাছে যে কামরায় ট্রান্সমিটার আছে তারই মধ্যে দুটো চারপাই। ওরই মধ্যে শুতে হয়। ওখানে সিভিল ড্রেসের চাকরি। ওখানে ড্রেস পড়া নিষেধ। লুঙ্গি গেঞ্জি পরে চাকরি করতাম। বড় জোর প্যান্ট জামা পরতে হতো। মজার ব্যাপার। কোনো প্যারেড টাইমিং নেই, আউট পাশের প্রয়োজন নেই। প্রায় প্রতি রবিবারে বাংলা সিনেমা আসে। তাছাড়া হিন্দি সিনেমা যখন ইচ্ছে দেখা যেতে পারে। রাত্রি নটায় গেলেও কোনো অসুবিধা নেই। সবথেকে বড় কথা ওখানকার অন্যান্য ছেলেরা ভারী ভালো। দিল্লি এর আগে ভালো ভাবে ঘুরেছি। এর আগেও তিনবার এখানে ছিলাম। তবুও যখন ইচ্ছা চাঁদনীচক বা অন্য কোনো জায়গা একবার ঘুরে আসতাম। কানু ওখানে ফ্যামিলি নিয়েছিল আনন্দ পর্বতের কাছে। ওর কাছ থেকে মাঝে মাঝে ঘুরে আসতাম। এইভাবে বেশ কাটছিলো। দাদার ছেলে রানার অন্নপ্রাশন ১লা মে। বাড়ি যেতে লিখেছে। মার্চে বুবুর বিয়েতে বাড়ি গিয়েছিলাম। আবার এত তাড়াতাড়ি কি করে যাবো ভাবছি। প্যারচাঁদকে বললাম, গুরমিত সিংকেও বললাম। সহজেই বারোদিনের ছুটি পেয়ে গেলাম। রানার অন্নপ্রাশনে বড় আনন্দ করে এলাম। মোটের ওপর সবকিছু মিলিয়ে দিল্লি ডিটাচমেন্ট এর চাকরি এত ভালো যে আর্মিতে অন্য কোনো জায়গায় এই সুযোগ পাওয়া যাবে না। মাঝে মাঝে RK puram এর অফিসে যেতে হতো বাংলাদেশের ট্রেনীদের চিঠি সেন্সর করার কাজে। সারা বাংলাদেশের যেসব ট্রেনিরা থাকত, তাদের চিঠিপত্র সেন্সর করতে হতো। ওদের জন্য অর্ডার ছিল, চিঠি পোস্ট করা চলবেনা। খোলা চিঠি অফিসে আসত। আমি বাঙালি বলে সপ্তাহে একবার ডেকে পাঠাতে ওই চিঠি পড়ার জন্য। চিঠিতে একমাত্র ঘরোয়া কথা বাদ দিয়ে অন্য কথা লেখার নিষেধ ছিল। ভালোভাবে পড়ে তারপর বাংলাদেশে পাঠানো হতো। ওই ভাবেই বাংলাদেশ থেকে আসা চিঠি পড়ে তবেই বাংলাদেশী ট্রেনিদের কাছে দেওয়া হতো। তা বাদ দিয়ে DGS এ ট্রান্সমিটার রিসিভার থাকতো। সারাদিনে পাঁচ-ছয় বার সময় দেওয়া থাকতো। ওই সময় ওয়্যারলেস সেট খুলতে হতো। DGS এর সাথে চক্রতা, ডুমডুমা, মস্তরাংও গোচারের যোগাযোগ ছিল। ওয়ারলেস সেট খোলা বাদ দিয়ে ওয়ারলেস সেটের ব্যাটারি চেঞ্জ করতে হতো। প্রত্যেক ছুটির দিন আউট পাস নিয়ে দিল্লি ঘুরতে বেরিয়ে যেতাম। আমাদের সাথে কেরালার একজন ছিল। সে ক্যান্টনমেন্টে এরিয়াতে ফ্যামিলি রেখেছিল। তাকে বলে দিয়েছিলাম, তোকে আসতে হবে না তোর ডিউটি আমরা করে দেবো সে ঘুষ হিসেবে ভালো মন্দ রান্না করে আনত। আমাদের খেতে দিত। খুব মজায় ছিলাম।

চক্রতায় থাকলে ফুটবল খেলা হত। এক বাঙালি অফিসার ছিলেন। ক্যাপ্টেন সেন ভার্মা। ফুটবল খেলায় খুব আগ্রহী ছিলেন। ক্যাপ্টেন সেন ভার্মা আবার সেসময়কার ভারতের চিফ ইলেকশন কমিশনার S.P. Sen Verma র ছেলে ছিলেন। খুব খোলামেলা কথা বলতেন। অগাস্ট মাস থেকে লগ ও প্রাইভেট চিঠি আস্তে আরম্ভ করলো চক্রতা থেকে। আমায় যেন ছুটিতে পাঠানো না হয়। কারণ EST-22 তে ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হলো বলে। গুরমিত সিং কে বলার পরে ও অনেক চেষ্টা করলো যাতে আমাকে যেতে না হয়। কিন্তু সেপ্টেম্বরের ১৫-১৬ তারিখে OC signal অনুরোধ করে পাঠালো যে আমায় যেন অন্তত কয়েকদিনের জন্য চক্রতায় পাঠানো হয়। খেলা শেষ হলেই আবার আমায় দিল্লি ফেরত পাঠানো হবে। বাধ্য হয়ে সুখের চাকরি ছেড়ে আমাকে আবার চক্রতার জন্য যেতে হলো। চক্রতায় তখনও কোনো প্র্যাকটিস শুরু হয়নি। হঠাৎ শুনলাম, খেলা ডিসেম্বরে হবে। শেষ পর্যন্ত অক্টোবরের শেষের দিকে খেলা হলো। প্রথম খেলায় ৯-৩ গোলে জিতলাম। পরেরটা HQ -এর সাথে খেলা। আমাদের অনেকের চোট লেগেছিলো। সেজন্য HQ এর সাথে খেলায় ১-১ এ ড্র হয়ে গেলো। নভেম্বর ১ তারিখে MOB. RED এর সাথে খেলা হলো। ৭-০ গোলে জিতলাম। এইভাবে EST-22 -র ফুটবল

টুর্নামেন্টে আমরা উইনার হলাম। কিভাবে জানিনা আমাদের টাইম ম্যাথু, বলরাম, বিশ্বাসের সাথে আমার এত সুন্দর জমেছিলো! যাইহোক খেলা শেষ হলে সাত তারিখে বিশ্বাস ও আমি দু মাসের ছুটি নিয়ে দেরাদুন পৌঁছলাম। দেরাদুনে ডান এক্সপ্রেসের মিলিটারি কম্পার্টমেন্টে ভালোভাবে শোয়ার জায়গা পেয়ে নভেম্বরের নয় তারিখে বাড়ি পৌঁছলাম।

বহুদিন মানে প্রায় দশ বছর পর জগদ্ধাত্রীপুজোয় ৭৪ সালে বাড়িতে থেকে বড় আনন্দ করা গেলো। আর এবছর ছুটিতে গ্রামে ছাড়তে টুর্নামেন্টে খেললাম। দুমাস বড় মজায় শেষ করে ৭৫ সালের পয়লা জানুয়ারি সকাল আটটায় দুন এক্সপ্রেসে আবার দেরাদুন পৌঁছলাম। ৭৫ সাল আমার খুবই খারাপ যাবে। মানে প্রায় সারা বছর আমায় ঘুরে বেড়াতে হবে। কোথাও স্থায়ী ভাবে বিছানা লাগাতে পারবোনা। কারণ বছরের প্রথম দিনই আমার রাস্তায় ট্রেন-বাসে কাটলো। দেরাদুন থেকে বাস টান্ডুয়া পর্যন্ত গেল। প্রচণ্ড বরফ পড়ছে বলে তার আগে আর গেলো না। টান্ডুয়া থেকে চক্রতা বাসষ্টান্ড পর্যন্ত দুটো কুলি করলাম। ভাগ্য ভালো ছিল যে কুলি পাওয়া গেলো। সাধারণ ভাবে এইসব জায়গায় কুলি পাওয়া যায়না। আট টাকা দিয়ে ওদের সাথে বেড হোল্ডার আর সুটকেস দিয়ে দিলাম। এত বরফে হাঁটাও মুশকিল। তখন বেশ বরফ পড়ছে। কোনোরকমে বেলা দুটো নাগাদ পৌঁছলাম। কিছু খেয়ে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

দোসরা জানুয়ারি থেকে আবার চক্রতার চাকরি শুরু হলো। তিন তারিখে শুলাম আমার মুভমেন্ট অর্ডার তৈরী হচ্ছে। দিল্লি যাবার জন্য। খবর শুনে খুশি হলাম। সব কিছু ঠিক হয়ে গিয়েছিলো দিল্লি যাবার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব গন্ডগোল হয়ে গেলো। এক্সারসাইজ এর জন্য একজনকে বি সেক্টরে যেতে হবে। যদিও ওসি চায় না আমাকে পাঠাতে অন্য কোনো সেক্টরে, কিন্তু ওপরতলার চাপে শেষ পর্যন্ত আমায় টেম্পোরারি বি সেক্টরে যেতেই হলো। বড় মন খারাপ হলো। দিল্লি যেতে পারলাম না বলে। চক্রতায় বেশ বরফ পড়ছে। পঁচিশে জানুয়ারি ওখান থেকে কালসিতে পৌঁছালাম। ওখানে দশদিন থাকতে হলো। প্রায় প্রতিদিন ঠান্ডা জলে স্নান করতাম। চক্রতায় স্নান করতে হলে গরম জলে করতে হতো। তাও ৮-১০ দিনের আগে হতো না। বেশ কয়েকদিন মজায় কাটিয়ে ফেব্রুয়ারি ৫ তারিখে কালসী থেকে সরসোয়া পৌঁছলাম রাত্রি প্রায় দশটায়। কোনোক্রমে রাত কাটিয়ে পরের দিন সকালে সিমলা যাবার জন্য তৈরী হলাম। সাহারানপুর, আম্বালা, চন্ডিগড়, কালকা হয়ে রাত্রে সিমলা ট্রানজিট ক্যাম্পে পৌঁছলাম। সিমলায় তিনচার দিন থাকলাম। এর মধ্যে অর্ডার এলো, আমায় এক্সারসাইজ এর জন্য ৩০টা PRC 10 সেট নিয়ে কারছিম পৌঁছাতে হবে। কারছিম যাবার জন্য গাড়িতে বসলাম। রাস্তায় দু তিন দিন লেগে গেলো। ১১-১২ তারিখে কারছিম পৌঁছলাম। pay না পাওয়ার জন্য অসুবিধা হচ্ছিলো। বাবাকে তো টাকা পাঠাতে হবে। একজনের কাছ থেকে ২০০ টাকা ধার করে বাবাকে ১৩০ টাকা পাঠালাম। ১৩ তারিখে আবার এক্সারসাইজ এর জন্য কারছিম থেকে সুনি পৌঁছে গেলাম। সিমলা থেকে মাত্র ৪৮ কিলোমিটার দূরে। তবে অনেক নিচে। তাই ঠান্ডা অনেক কম। ঠান্ডা জলে স্নান করতে কোনো অসুবিধা হতো না। প্রথমে মনে করেছিলাম এক্সারসাইজ এ অনেক কষ্ট হবে। কিন্তু ওখানে একজনের একটা কামরা পাওয়া গিয়েছিলো। বিজলি ও জলের খুব সুবিধা ছিল। ওই কামরায় আরো দুইজন আমার সাথে থাকতো। ওখানে নিজের কাজ করা আর খাওয়া দাওয়া শোয়া ভিন্ন আর কোনো কাজ ছিল না। মাঝে কাজের জন্য একদিন সিমলা যেতে হয়েছিল। একদিন সুনিতে একটা হিন্দি সিনেমা দেখলাম। মেহেরবান আমার আগেই দেখা ছিল। এক্সারসাইজ শেষ করে মার্চ মাসের ১৯ তারিখে সুনি থেকে আবার কারছিম আসার জন্য তৈরী হলাম। এক্সারসাইজ এর মধ্যে TOT আর F of S চক্রতা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমি ঠিক রাজি হইনি। কেন জানিনা ওখানে চাকরি করতে আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। ১৯ তারিখে কারছিম পৌছালাম। ওখানকার রাস্তা এমন চলার সময় একমাত্র ভগবানই ভরসা। কে বাঁচবে আর কে মরবে কেউ জানে না। কারছিম পৌঁছে আরেক বিপদে পড়লাম। বৃষ্টি হওয়ার জন্য পাহাড়ের উপর থেকে পাথর পড়তে আরম্ভ করেছিল। সিমলা থেকে কারছিম পর্যন্ত রাস্তায় কত জায়গায় যে পাথর পড়েছে তার কোন হিসেব নেই। ওই সময় গাড়িতে যাওয়া আসার সময় এমনও হতে পারে পাথর সোজা গড়িয়ে উপরে পড়তে পারে। এমন অনেক সময় হয়েছেও। কারছিম গরম জলের "চশমা" আছে। সেখানে স্নান করবার সময় একজন তিব্বতির উপর পাথর এসে লাগে এবং সে মারা যায়।

যাই হোক কারছিমে কয়েকদিন ছিলাম। বড় ভয়ে দিন রাত কাটিয়েছি, পাথর পড়ে অনেক ক্ষতি হয়েছে। কারছিম থেকে মস্তরাং-এ আসার জন্য সকলে তৈরি হল ২১ তারিখে। আমিও তৈরি ছিলাম। কিন্তু sparrow বলল কয়েকদিন কারছিমে থাকো। কারণ EST এখনো মানছে না যে তুমি সেক্টরে থাকো। মস্তরাং-এ পৌঁছে ESTতে লগ দেব। যদি ওরা মানে তাহলে ভালো কথা, তাহলে তোমাকে মস্তরাং-এ ডেকে পাঠাবো, আর যদি না মানে তো এখান থেকে চক্রতায় ফিরে যেও। অযথা ৩৮-৩৯ কিলোমিটার যাওয়া-আসা করবে কেন ? তিন চারদিন পরে হেডকোয়ার্টার থেকে লগ এল আমাকে EST-তে যত শীঘ্র সম্ভব ফেরত পাঠানো হোক। সেই দিনই চক্রতা যাওয়ার জন্য তৈরি হলাম। যখন কালসী গাড়ি যাবে সেই গাড়িতে যাব। ঠিক তার পরের দিন খবর এল S.B. Singh ছুটির জন্য দরখাস্ত করছে। সেই জন্য EST থেকে special permission পাওয়া গেছে, আমি জুন-জুলাই পর্যন্ত এখানে থাকব। ফৌজি হুকুম, করার কিছু নেই। ২৭ তারিখে থেকে কারছিম থেকে মস্তরাং-এ আসার জন্য সকাল প্রায় ছটায় বেরোলাম। আসার আগে যথেষ্ট ভয় লাগছিল। কারণ ৩৮ কিলোমিটার জিনিসের সাথে হেঁটে আসা সোজা কথা নয়। তবুও আসার সময় খুব কম জিনিস নিয়েছিলাম। লেপ, কিছু ফৌজি জামা কাপড় আর দু'চারটে টুকিটাকি জিনিস যেটা প্রতিদিনই লাগে। আমার সাথে অমৃক সিং ছিল। বরফের উপর দিয়ে হাঁটা, তাও এত লম্বা রাস্তা। যা কষ্ট হয়েছিল তা আমিই জানি। সেদিন মনে হয়েছিল এইরকম চাকরি করার কোন মানে হয় না। বেলা ১১ টা পর্যন্ত এরকম চলেছিল। কিন্তু তারপর ১২টা ১৫ পর্যন্ত কিভাবে হেঁটেছি তা আমি নিজেই জানিনা। ১২টা ১৫য় সাংলা পৌঁছালাম। মাঝে আরেক বিপদ। ঐদিন আবার দোল উৎসব ছিল। আর এখানে সেটা বেশ বড় উৎসব। আশ্চর্য এই বরফে কিভাবে উৎসব করছে। রাস্তায় ছেলেমেয়েরা কিছুতেই ছাড়ল না। মুখে রং মাখিয়ে ছাড়লো। ৭৫ সালে দোল আমার সাংলায় হল। সেইদিন আর সাংলা থেকে এলাম না। ওখানকার detachment-এ ঐদিন থেকে পরের দিন সকালে মস্তরাং-এর জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম আবার সকাল প্রায় ছটায়। যতই উপরে যাচ্ছি ততই বরফ বেশি মনে হচ্ছে। আজও ওই গতকালের মত অবস্থা। প্রায় ১২ টায় মস্তরাং পৌঁছালাম। এখানে পৌঁছানোর পর মনে হল কয়েক দিনের কষ্ট দূর হল। দুপুরে সামান্য খেয়ে সারাদিনই প্রায় শুয়ে রইলাম। বলবিন্দরকে তো আগেই জানতাম। চন্দ্রের সাথেও আলাপ হল। বেশ ভালো ছেলে। মার্চের ২৮-২৯ তারিখ, এখনো পর্যন্ত ব্যারাকের মাথা পর্যন্ত বরফ। এখানে সব থেকে বড় কাজ বরফ হটানো আর কাঠ এদিক ওদিক থেকে জোগাড় করে সকাল আর রাত্রে জ্বালানো। দরকার হলে কাঠ চুরি করো না হয় নিজের পয়সা দিয়ে কিনতে হবে। কারণ কাঠ না থাকলে এখানে দিন রাত কাটানো মোটেই সম্ভব নয়। কাঠ নিয়ে এসে নিজেকেই কাটতে হবে।

মস্তরাং-এ পৌঁছে আর একটা বিষয় দেখলাম, তাজা তরকারি বা মাংস এখানে নেই। আসবে কি করে? খালি হাতে বরফের উপর দিয়ে ৩৮ কিলোমিটার আসাই মুশকিল। তাহলে ওই সব জিনিস কি করে আসবে। "সুনী"তে থাকা অবস্থায় বিশুদার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিলাম অপুর বিয়ে। সেই জন্য কিছু টাকা পাঠাতে হবে। ৩০০ টাকা পাঠাবো বলে চিঠি লিখে দিয়েছি। অসীমের কাছ থেকেও চিঠি পেয়েছি। সেও কিছু টাকা চায়। জানিনা এরা সকলে মনে করেছে আমার কাছে বোধহয় অনেক টাকা আছে। অসীমকে টাকা পাঠাবো না বলে লিখে দিয়েছি। যতদূর মনে হয় বড়দা ও অসীম চিঠি পড়ে রাগ করে থাকবে। এদিকে জানুয়ারি থেকে এখন এপ্রিল হয়ে গেল – মানে চার মাস মাইনে পাইনি। বাবাকেও টাকা পাঠাতে পারিনি। খরচ করার মতো পকেটে একটা পয়সাও নেই। কিভাবে দিন কাটাচ্ছি আমিই জানি। S.B. Singh চক্রতা গেছে। জানিনা কবে আসবে। SKT চক্রতা থেকে এখানে পোস্টিং-এ আসছে শুনলাম। এপ্রিলের ১৫ তারিখ হয়ে গেল এখনো এখানে বরফ পড়ছে, তাহলে এবছর কতদিনে বরফ গলবে, আর আর কত দিনে তাজা সবজি আসবে ! এখানে কয়েক জন আছে যারা সত্যিই ভালো। আর কয়েকজন আছে যারা প্রচন্ড স্বার্থপর। যাক আমি তো মাত্র কয়েক মাস এখানে থাকব, এসব চিন্তা করে লাভ নেই। এখনো পর্যন্ত মাইনে পেলাম না। জানিনা কবে পাব। বাবা বাড়িতে কিভাবে খরচ চালাচ্ছেন কে জানে। মাইনে পেয়ে বাবাকে একসাথে সাড়ে ৩০০ টাকা পাঠিয়ে দেব। এখানে কোন প্যারেড ট্রেনিং নেই। যখন খুশি তৈরি হও। মাঝে মাঝে কাজ থাকে, নাহলে বেশিরভাগ সময় গল্পের বই পড়ে সময় কাটাতে হয়। নানারকম আরাম থাকা সত্ত্বেও এখানে একটা সাধারণ মানুষের বাঁচার পক্ষে যা দরকার সেটা নেই। সারা দিনরাত ওই কামরা আর আগুনের কাছে বসে হাত

পা গরম করা আর মেসে তরকারি মাংস খেয়ে মানুষ কতদিন আনন্দে থাকবে। এখানকার থাকার জন্য যে কামরা তৈরি হয়ে আছে সেগুলো যে কোন সময় পড়ে যেতে পারে। বিশেষ করে বড় রকমের "আঁধি" হলে তো নিশ্চয়ই পড়ে যাবে। হরলিং-এ যেভাবে ভূমিকম্প চলছে এখানে সেরকম ভূমিকম্প হলে একটা কামরাও থাকবে না। কাঠের রোলা দিয়ে কাঠামো, আর কাঠামোর উপর এখানে একরকম ভোজপত্র পাওয়া যায় তাই চড়ানো। আর দেওয়াল টুকরো পাথর দিয়ে তৈরি, কোন প্লাস্টার নেই। যে কোনো সময় ধাক্কা মারলে পড়বেই। শোয়ার জন্য নিজেদের তৈরি কাঠ দিয়ে কোনো রকমে চারপাই, যেটাকে মোটেই চারপাই বলা যায় না।

(চলবে)

Prasanta Chatterjee — 76 years. Retired from Indian army on 1978. Later worked at Indian postal service. Retired on 2001. Passionate footballer. Played for Indian army team. Stays at Gopalnagar, Kolaghat, East Midnapore, West Bengal, India.

মুক্তগদ্য সিরিজ 'তেরো অপয়া নয়'

পারিজাত ব্যানার্জী

দশদিকে দিগন্ত !

পর্ব ১০, ১১, ১২ ও ১৩

(পর্ব ১০)

নাঃ, সত্যি বলছি মা ।ওই দিক টিক আমি বুঝি না । আমার কাছে দশদিকের তাই খুব একটা আলাদা কোনো মাহাত্ম্যও নেই তাই! উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম – এই চারদিকের হিসাব ঠিক করতে গিয়েই যা হিমশিম খাই আজকাল যে কি বলব ! তালগোল পাকিয়ে একেবারে 'হযবরল' যাকে বলে আর কি ! তবু আমার মানা না মানায় আর কি এলো গেল বলো ? সবই তো আপেক্ষিক! সুখের কথা অবশ্য, এই দশ দিকে ঠিক তাই !

যদি ফাঁকা এক মাঠে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি কোনো বিকেলবেলা নিশ্চিন্তে, তারপর যখন ভাবি, কিভাবে যাব বাড়ি, প্রথম প্রশ্নই যেটা আসবে তা হল – "আচ্ছা, বাড়িটা যেন কোন দিকে ?"

দশ তো নয়, অজস্র ছোট ছোট দিক একে অপরের গা সাঁটাসাঁটি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের চারপাশে । তাদের কোনটা ছেড়ে কোনটায় বেছে এগোবে বলোতো ? হিসাবের সুবিধার্থে কেউ তখন সমগ্র ঘূর্ণায়মান দিকের গতিবিধিকে দশদিকে ভাগ করেছিল হয়তো কখনো, তো কেউ আবার বেছে নিয়েছিল চারদিক । কেউ আবার কোনো ভাগাভাগিতেই যায় না । সোজা যেই দিক এসে দাঁড়িয়েছে চোখের সামনে তাকেই পায়ের তলার সঙ্গী করে হাঁটা লাগিয়েছে সজোরে । সে পথে বাড়ি পড়লে ভালো, নয়তো অগত্যা যে খুঁজে নেওয়া দরকার নতুন আস্তানা ! কষ্ট হয়তো হয় পুরোনো খোলস ছেড়ে আসা দিকটা ফেলে আসতে, তবু এর চেয়ে ভালো কোনো উপায় দিক উন্মোচন করা সম্ভব বলেও তো মনে হয় না ।

সব দিকে এমন সপাটে চলে যাওয়াটা যদিও সহজলভ্য নয় । সবখানে বাড়ির খোঁজ দেওয়ার লোকও যে আর জোটেনা তেমন ভালো ! কেউ হঠাৎ রেগেমেগে আঙুল তুলে বলবেন, "ও পথে ভিনধর্মীদের বাস !", কেউ বলবে সাবধান করার ছলে, "ওদের বিশ্বাস নেই । ওরা সব চোর,ডাকাত, বদমাশ !" কেউ পেতে দেবে কাঁটাতারের শক্ত বেড়া, "ঢুকবে না আমার দেশে । তুমি শত্রুপক্ষ – একদম ফেলবে না আমার ঘরে তোমার পায়ের ছাপ !" তো কেউ আবার বিকৃত মুখে হাসবে, "ভিখিরিদের দরজায় দাঁড়ানোর কিন্তু জেনে রাখো, আজকের দিনেও নেই কোনো মাপ !"

দিকগুলো এভাবেই কমতে শুরু করে একটু একটু করে । দিশেহারা চোখে বাউলমন যখন চেয়ে দেখে আশপাশ, বেশিরভাগ স্তরেই জোটে অবহেলা, কুড়িয়ে পাওয়া যায়না খরকূটো আর সামান্য কটা শক্তপোক্ত বাঁশ ! নতুন প্রতিমা তৈরির অপেক্ষায় চলতে থাকে জীবন যেমন তেমন করে । ঘর জোটে না, মানুষ মরে, সমুদ্র মুখ ঢাকে ।

এমন করেই বোধহয় শুরুর সে দিনেও এসেছিল কোনো বিপ্লব ! মানুষ বুঝেছিল, সবদিক ভাবা যাবে না নিজের ঘর ! হাজার হাজার দিক কমে থমকে এসে দাঁড়ায় তখন কেবল দশে – বাড়ি খোঁজার উৎসাহ কমে জীবনের সেই ই বিচিত্র সন্ধিক্ষণে ! এরপর একসময় পুরুষেরা ঘর বাঁধে কোনো এক "সঠিক" দিক নির্ধারণ করে – সেখানেই । একে একে জড়ো হতে থাকে তাদের স্ত্রী, সংসার, আত্মীয় পরিজন । জন্ম হয় একান্ত নিজস্ব এক বাস্তুভিটের দর্শনের ।

তবু দিকে দিকে গিয়ে নতুন বাসার সন্ধান করার আদিম সত্ত্বা কি এত সহজে আর লোপ পায় নাকি, বলো ? তাই আজ তুমিও হয়েছো ঘরছাড়া, তারও তো বলো, বেশ ক বছর হল ! ভেবোনা মা, দিক নির্ণয়ে যতই অপটু হই, জানবে তবু পৌঁছব কিনারে আমিও সময় মতোই!দেখো ঠিক, যেদিন এই টুকরোটাকরা দশ দিক মিলে যাবে সুনিপুণ হাতে বোনা একসূত্রে, আবার করে নবজন্ম ঘটবে চির অমলিন নবদিগন্তের !

(পর্ব ১১)

এগারোর গেরো

সত্যি কথা বলতে মা, এই এগারো সংখ্যাটি বরাবরই আমার বেশ পছন্দের। কেন বলোতো, দেখি কেমন পারো ! আরে বেশি দূরে যেতে হবে না, আমি বরং বলেই দিই, কেমন ? কারণটা আর কিছুই না, ১১-র নামতা মুখস্থ করাই যে সবসময় অন্যদের থেকে সোজা ! ১১, ২২, ৩৩, ৪৪ – বেশ মজার ব্যাপার, তাই না ? কি সুন্দর যেন লয় মেপে মেপে ছোট্ট ছোট্ট ঝাঁপ – সুরেলা এই এগারোর প্রেমে যে পড়ব না কখনও, তা আবার হয় নাকি ?

তা এই নিরীহ এগারো কিন্তু একা আমার প্রিয় হয়নি, এ হল গিয়ে বিশ্বজনীন "শুভ" সংখ্যা।ওই যেমন ১৩ হল "অশুভ" – অনেকটা ওরকমই আর কি ! তবে সংখ্যাতত্ব অনুযায়ী "এগারো দশমিক এগারো" হল এই জগৎ সংসারে সবচেয়ে পবিত্র মুহূর্ত। ঘড়িতে হঠাৎ যদি এই সময়ে চোখ যায়, তখন টুক করে নিজের প্রার্থনা সেরে নিলে তা নাকি ফলবেই ফলবে ! কোনো দুষ্টচক্রই তখন আর কিচ্ছুটি করতে পারবে না ! এমনটা আমি বলছি না। বলছে গুগল !

আমি বরং এর উল্টো একটা কথাই আজ বলব তোমায়। না, এগারো সংখ্যা বা এগারোটা বেজে এগারো মিনিট নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, এইসব শুভ অশুভ কোনোটাই সময়ের বা সংখ্যার হেরফেরে হয় না – হয় মানসিকতার ব্যবধানে। তাই আজগুবি নিউমেরলজি, অ্যাস্ট্রোলজি এসব ছেড়ে বাস্তবধর্মী হয়ে নিজের দায়িত্বেই বলছি – এগারো আমার জীবনে কিন্তু এসেছিল বেশ গেরো হিসেবেই এক ভুল সন্ধিক্ষণে। নানা মা, কপালে ভাঁজ পরার মতো তেমন কিছু নয় – আবার অন্যরকম কিছু তো বটেই !

হিসেব মতো এগারো বছর বয়সটা কিন্তু তেরো থেকে উনিশের প্রাক যৌবন পর্যায়ে পরে না। তবুও বেশ মনে আছে, হঠাৎ করে শারীরিক প্রক্রিয়ার কিছু পরিবর্তন এই সময়ই বড় বেশি করে দেখা দেয় মেয়েদের জীবনে। "মেয়ে" বললাম, কারণ এ কথাগুলো আমার এবং আমার পারিপার্শ্বিক মেয়েদের অভিজ্ঞতার সূত্রধর – এর সাথে, বিশ্বাস রেখো, নারীবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আসলে কো-এডুকেশনের সুত্রে অনেক ছেলের সাথেই আমার বন্ধুত্ব ছিল। তাই দেখেছি, সেসময় সমবয়সী বেশিরভাগেরই এগারো বছর বয়সে হরমোনের গতিপ্রকৃতি পাল্টাতে শুরু করে না। তারা তখনও দিব্য মহানন্দে "ছোট"টিই থাকে।

অথচ হঠাৎ বড় হয়ে উঠি আমরা। মানে, আমাদের পরিবর্তনশীল শরীরটা। তার সাথে তরতর করে লম্বা হয়ে যাওয়ার ওই শেষ ধাপে এতটাই অস্বস্তি হত, যে মনে হত কুঁকড়ে দুমড়েমুচড়ে আবার বেশ ছোট করে দিই নিজেকে আগের মতোন। পুতুলখেলা, হইহুল্লোড় সবই কিন্তু চলতে থাকে তখনও ছোট্ট মানুষটার অবচেতনে, তবুও বাইরের সবাই মনে করাতে ছাড়ে না একবারও ! – "এ বাবা ! কি বড় হয়ে গেছিস রে ?", "ও মা ! তোকে দেখে আর ছোট মনেই হয়নাতো একদম !"

অসুবিধা বড় মনে হওয়া শরীরের যেমন হয় – ঠিক তেমনই অসুবিধা রয়ে যায় আগের মতোই সেই ছোট থেকে যাওয়া মননেরও। যেন অন্য কারও শরীরবৃত্তীয় খাঁচায় আটকে এক ছোট্ট জন্মানো বদ্রিকা। আহারে ! কি অসহায়তা বলোতো !

তবে অমন টালমাটাল পরিস্থিতিতে ভাগ্যিস তুমি ছিলে ! লক্ষ্য করে দেখেছি, তুমি যেন আমার ওই ভীরু চোখে আরও একবার হাতড়ে বেড়াতে নিজের ছোটবেলা ! বড় হওয়ার পাঠও দিতে নিজের মতো করে। উফ ! তুমি না আমার সত্যিই সোনামণি মা !

এগারোর এই গেরো থেকে বেড়িয়ে আদৌ আমি বেড়ে উঠেছি কিনা জানিনা, তবে এটুকু বুঝেছি এখন, প্রতিটা পর্বের শুরুটা হবে টালমাটালের মধ্য দিয়ে। তবু তাতে থেমে না গিয়ে, এগিয়ে চলাই বেঁচে থাকার সমার্থক ! আর সবক্ষেত্রেই ঠিক ভুলটা যেমন আপেক্ষিক – এগারোও সেই একই যুদ্ধের শরিক !

শুভ অশুভ বলে আসলে কিছু হয় না। সবই এগারোর নামতার মতোই প্রাঞ্জল ! সময়ে সময়ে শুধু পাল্ট যেতে হয় নিজের দর্শন !

(পর্ব ১২)

বারো দিনের আনন্দ বিধি

তুমি তো জানোই মা, ধর্ম নিয়ে ভেদাভেদ কোনোদিনই আমার ঠিক বোধগম্য হয়না। আমার কাছে সবকিছুতেই লুকিয়ে থাকে শুধু উৎসবের আমেজ। তার রেশ যত বেশিদিন থাকে আমাদের মননে, ততই যেন উন্মেষ হয় অন্তরাত্মার। ঘটে প্রশান্তি। দুর্গাপুজোর চারদিন ধরেই হইহই করি যেমন, তেমনই আবার ঈদের মরশুমে তোমার হাতের সেওয়াই, বাদাম হালুয়া, বা চেনা বন্ধুদের বাড়ি থেকে পাঠানো হালিম, বিরিয়ানী, ফিরনি দিয়েও বেশ মনোহর ভুড়িভোজ হয় বইকি ! তার সাথে কেনা রঙিন চুরি, অনারকলি সালওয়ার স্যুট - জমে একদম ক্ষীর হয়ে যায় কিন্তু সব ! কি বলো !

তবু শীতকালীন বারো দিনের আনন্দের মজাই আলাদা ! ওই যেমন বলে না, "12 Days of Christmas" অনেকটা ওই ছন্দেই বাঁধা এই বিধি। না, না – বিশ্বাস করো মা, কোনো ধর্মীয় মতাবলম্বনের জন্য নয়, শুধুমাত্র এই সময়টায় পরা জাঁকিয়ে শীতই এই সামান্য হলেও পক্ষপাতের জন্য দায়ী। বিহারের শীতে জন্মেছি বলেই বোধহয়, সারাবছর গরমে যেই কষ্ট পাই, তা সুদে আসলে তুলে নিতে চাই প্রতিবছর এই কদিনে। এই সময়ই তো হালকা কিছ গায়ে চাপিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়ানো যায় আশপাশ। আমি তো মনে করি যদি আমাদের কলকাতাও শীতের দেশ হতো, তাহলে তেরো নয়, অন্তত ছাপ্পান্নখানা উৎসব লেগে থাকত আমাদের সারা বছর জুড়ে ! ভাবোতো, কি ভালোই না হত তখন ? সব হিংসা দ্বেষ ক্লেশ ভুলে সারাবছর খালি বাজতো হুল্লোড়ের বাদ্যি মনোরম !

যাক সে কথা। জানি ভালো করেই জানি এবং মর্যাদাও দিই তোমার সে কথনকে – "যা পেয়েছো, জানবে, তাই অনেক !" তাই ক্রিসমাসের বারো দিন কথাটিকে আক্ষরিক অর্থেই আমি মিলিয়ে দিয়েছি আমার আনন্দের কাঁটার গতির সঙ্গে। সেই হিসাবে শুধু বড়দিন নয়, আমার বারোটি আনন্দময় দিন ছড়িয়েছিটিয়ে বিছিয়ে রয়েছে সারা শীতকাল অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি অবধি। দেখো তো মা, নীচে দেওয়া তালিকাটা মিলে যায় নাকি তোমার পছন্দের সাথেও ?

১) পয়লা ডিসেম্বর – বছরের শেষ মাসের প্রথম দিন। উৎসব সূচনার প্রাকলগ্ন। হঠাৎ করেই যেন গ্রীষ্মের ভারী নিশ্বাস উবে গিয়ে নেমে আসে হিমেল পরশ শহরের বুক জুড়ে। ও হ্যাঁ – ওদিন থেকে জানোতো মা, অনেক বাড়িতে পাকাপাকি ভাবে নাকি বন্ধ হয়ে যায় পালাও সে শীত পরুক আর নাই পরুক ! ভাগ্যিস, আমরা দুটিতে বাড়ির এসব আজগুবি নিয়ম মানিনা কখনও !

২) জন্মদিন – নিজের জন্মদিন-উপলক্ষে হইচই করতে অনেকেই হয়তো মানা করবেন, তবে তোমার ছোটবেলা থেকে দিয়ে আসা প্ররোচনায় আমি কিন্তু আজও উদযাপন করি এই দিন। নিজের বেঁচে থাকা বাকি দিনগুলোর হিসাবের গরমিল তখন শুধরে দেওয়া যায় অনায়াসে।

৩) ২৪শে ডিসেম্বর – কাল বড়দিন, তাই আজ ব্যস্ত থাকি কেক আনায়, ক্রিসমাস ট্রি সাজানোয়, আর সান্তাবুড়োর সবুজ একপাটি মোজা বারান্দায় ঝোলানোয় ! ওই যে বললাম না আগে, এত বড় পৃথিবী আর তার গোপনীয় সব ঠিকানা, সে তুলনায় আমরা ছোটই না হয় থাকলাম বরাবর নানা বাহানায় !

৪) বড়দিন – ঘোড়ার গাড়ি, ভিক্টোরিয়া, ঢাউস হ্যাট, সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রল, পার্ক স্ট্রিট, ফ্লুরিজ – এসব তো রয়েছেই নস্টালিজয়া মাখা পুরোনো লাল রাস্তায়, তবে সত্যি বলতে আমার অন্যরকম কিছু অভিজ্ঞতাও রয়েছে মা বড়দিনের। এই যেমন বন্ধুর বাড়ি নারায়ণ পুজো বা থাই গোষ্ঠীর বৌদ্ধ উপাসনা ! অনবদ্য ! এসব যত দেখি, তত বুঝি, সত্যিই এইদিনটা কত "বড়" !

৫) ৩১শে ডিসেম্বর – বছরের শেষ দিন যখন, তখন নাচ গান আড্ডায় মুখরিত তো করে তোলাই যায় চারপাশ, তাই না ?

৬) পয়লা জানুয়ারী – মনে আছে মা, বছরকার দিনে পুজো দিতে একবার দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলে ! কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে সে কি ভিড় ! ঢুকতেই পারিনি মন্দিরে। অবশ্য অমন ভিড় এখনো হয় ইকোপার্কে, চিড়িয়াখানায় বা যেকোনো সেক্ষি উপযুক্ত জায়গায় !

৭) পিকনিক ডে – জানুয়ারীর প্রথম দু সপ্তাহের মধ্যেই প্রায় প্রতিটি বাঙালি ঘুরে নেয় কোনো না কোনো পিকনিক স্পট। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। তবে ছোটবেলায় চিড়িয়াখানায় জিরাফের ঘেরাটোপের বিপরীতে বসে তোমার হাতে তৈরি লুচি তরকারি মাংস হারিয়ে দেয় দিব্যি আজকের অফিসের ঝাঁ চকচকে ব্যবস্থা আর ক্যাটারিংয়ের রান্না।

৮) শীতলতম দিন – নাঃ। কলকাতার ঠাণ্ডায় কখনই বরফ পরবে না। তবুও তাপমাত্রা যখন একদিন হলেও ৯ বা ১০ ডিগ্রীতে নেমে যায় ফস করে, ওই শিরশিরে ঠাণ্ডায় কম্বল মুড়ি দিয়ে ওম করতে করতে জম্পেশ কোনো থ্রিলার বই পড়ার মজাই আলাদা!

৯) পৌষ সংক্রান্তি – পিঠেপুলি ! মালপোয়া, পাটি সাপ্টা, গোকুল পিঠে, ছানার পায়েশ, পোঙ্গল – নাহ ! আর নাম নেবো না ! খিদে পেয়ে যাবে যে !

১০) বইমেলা – আহ ! যেন এক সমুদ্র শব্দের মধ্যে লিখে চলা নিজের সাতকাহন !

১১) সরস্বতী পুজো – সেই যেদিন ছোট্ট সাদা রঙের শাড়ি পরা সরস্বতীকে এনেছিলে আমাদের ঘরে, সেইদিন থেকে ঈশ্বরীর ওই বৈরাগী রূপই কেমন করে জানি লেগে রয়েছে আমার মননে ! পুজো নয়, এ যেন খুব নিকট কারও জন্মদিন যার আয়োজনে কেবল সমৃদ্ধ হই আমি নিজেই !

১২) ভ্যালেন্টাইনস ডে – প্রেম উদযাপনের সত্যিই কোনো বিশেষ দিন লাগেনা মা। তবে সেকথা তো প্রযোজ্য অন্য সব অনুষ্ঠানেও, তাই না? যতদিন যুদ্ধকে শুধু একটি দিনে বেঁধে ফেলতে না পারি আমরা, প্রেমদিবস অন্তত পালন করা খুব জরুরী। প্রাসঙ্গিক। কি বলো?

(পর্ব ১৩)

তেরো নদীর লাগামছারা পার !

"আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে / সাত সাগর আর তেরো নদীর পাড়ে !" – এই সাত সাগর নিয়ে অনেক কথাই তো হয় মা, তবু তেরো নদী কেমন পড়ে থাকে দেখো বেনোজলে ! ওরা যেন সতীন কারও সন্তান – ওদের নিয়ে যায়না বলা কথা তাই অমৃতসমান !

নাঃ, আজ বরং আমি বলব। ওদের নিয়েই না হয় হবে কিছু যুক্তি তর্ক গল্প। সেই নাম না জানা তেরো নদীর পথও তো বড় সুগম ছিলনা কখনও, তাই না ? কত ঝড় ঝাপটা পেরিয়ে কোন পাহাড়ের মাথায় শুরু হয় তাদের প্রথম ঘাত প্রতিঘাত। সু-উচ্চ গিরিরাজের সাদা জটার কোটরে জন্ম এদের বেশিরভাগেরই। তারপর একসময়ে প্রকৃতির অমোঘ খেয়ালে সটান তারা ঝাঁপ দিয়েছে সেই জলসুধা গিরিখাত বেয়ে। তখনও কি পেয়েছিল তারা জানতে যে বিরহের কঠিন বাস্তব ঘিরে ধরবে তাদের অচিরেই ? কত ক্ষীণ তটিনীর শুকিয়ে গেছে জল পথিমধ্যেই রুক্ষ শুষ্ক পাহাড়িয়া বুকের পাঁজরে। কেউ বা আবার

হাপিত্যেশ করে রয়েছে বর্ষার এক আঁজলা জলের বেহিসাবী আশায়। সেই জলের যোগানের শেষেই হয়তো মিলন হবে তার সোহাগের সাথে – এই ভরসায় ! ভাবো তো, যে নদী আমাদের জলের সংস্থান করে, তারও কেমন কখনও কখনও দরকার পড়ে এক পশলা বৃষ্টির ! জীবন যেমনভাবে বসে থাকে স্থবির অযাচিত কান্নার প্রতীক্ষায় – এ যেন সেরকমই কোনো ভাবসমাধি, একান্ত প্রয়োজনীয় যা নিরূদ্দেশের পথচলায়।

একসময় পাহাড়ী পথ বিদায় জানায় ঝর্ণাকে। বলে, "এতটুকু পথই তোমার সাথে চলার কথা ছিল আমার ! এবার তাহলে বিদায় ?"

যৌবনোচ্ছল যুবতী গভীর অভিমানে ভর্ৎসনা করে গিরিপথকে, এঁকেবেঁকে চূর্ণ করে দিতে চায় সে উদ্ধত শিখরের দম্ভ। একসময় সব কষ্ট বুকে চেপে ধরে সে ঝাঁপ দেয় ঢাল বরাবর। গিরিরাজ অপেক্ষায় থাকেন দাঁড়িয়ে আরও কিছুক্ষণ প্রত্যুত্তরের আশায়। তবু ফিরেও তাকায় না সেই বিরহিণী আর কখনও তাঁর পানে !

উদ্দাম ঝর্ণার জল ঢালু জায়গায় আছড়ে পড়তেই পায় বিস্তীর্ণতা। তার উচ্ছ্বলতা কমে যায়, আসে একরাশ সফেদ পুরু অভিব্যক্তি ! তার নতুন রূপেও আর বিচলিত হয়না অবশ্য নদী। কারণ, এই স্থিরতা যে সাময়িক, কিভাবে যেন তা অবিলম্বে আঁচ করে ফেলে তার একাকী অদেখা সে মনন !

পথিমধ্যে অনেক বন্ধু জুটে যায় তার। কারও নাম শাখা, কেউ বা আবার প্রশাখা। নদী অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখে তার ফুলে ফেঁপে ওঠা রূপকে। সে শুধায়, "তা হ্যাঁগো সখীরা, তোমরা কারা? কোত্থেকেই বা এসে জুটলে শুনি আমার গভীরে ?"

খিলখিল করে ওঠে বাকিরা। "এমা আমরাও যে সেই আদি তেরো নদীর অংশ গো ! চিনতে পারছো না ? তোমার সাথেই তো মিলে চলেছি পূর্ণতা অর্জনের সততায় !"

ধাঁধা লাগে নদীর। "কোন তেরো নদীর কথা বলছো বলো তো ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারিনা !"

এক শাখা হাত বোলায় তার সিক্ত আঁচলে। "সে অনেক গল্প ! অত কি আর আমাদের কানে আসে ? সেই ষড়যন্ত্র করেছেন কখনও গিরিরাজ সাগরকূলে বসে। আমরা তো কেবল সে আজ্ঞাবহ দূত। শুধু শুনেছি, উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের জল সরবরাহের জন্যই আমাদের এই কৃচ্ছ্রসাধনা নাকি চলবে অনন্তকাল ! নাও, তাড়াতাড়ি পা চালাও দেখি ! দেরী হয়ে যাচ্ছে যে বড় !"

মাঝে মাঝে পাহাড়িয়া উদ্দামতার সুখস্মৃতি ভার করে দেয় নদীকে। তার মনে হয়, ছুট্টে ফিরে যাবে সে আবার তার জন্মলগ্নের ঠিকানায়। সখীরা হাত ধরে টানে তারে কেবল ! উফ, সত্যি বাবা, ওদের যেন বড্ড বেশী তাড়া ! দু দণ্ড দাঁড়াতেও দেবেনা যেন কখনও তাকে আর মনকেমন মেখে !

সমতল পৌছতে রাত হয়ে গেল অনেক। সারা পথের ধকল মেখে আসা ঘোলা জলটা আঁধারে যেন মনে হচ্ছে পাঁক – দেখলেই কেমন ঘিনঘিন করে ওঠে শরীর। এরূপে কেমনে গিয়ে দাঁড়াবে সে তার অভিষ্টের থানে ? আর্তনাদ করে কাঁদতে ইচ্ছে হয় খুব নদীর। কষ্ট হয় গিরিশিখরের মাঝে বয়ে চলা তার স্বচ্ছ স্নিগ্ধশীতল সলিলবরণ মনে করে। অমন রূপকেও তো হেলায় অগ্রাহ্য করেছিলেন গিরিরাজ – সমুদ্রের আজ আর কি দায় তাকে মুক্তি দেওয়ার ? যদি তিনিও মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে ? শাখা প্রশাখা উত্তর দিতে পারে না। চিন্তার কালিমা তাদের আঁখিপল্লবেও স্পষ্ট। আর কতকাল বয়ে চলবে তারা এমন রূপহীনা ?

স্পষ্ট বুঝতে পারে নদী, তার জলে বাসা বাঁধছে বিষ – শোধন দরকার।

এরপরের গল্পটা আর বলে যায়নি মা নদী আমায়। পুরাণে লেখা তেরো নদীর যে আজ কত ভাগ হয়েছে, কতজনার তৃষ্ণা নিবারণ করতে গিয়ে আজ তারাই হয়েছে শোষিত, কত দূষণ আরও পঙ্কিল করেছে তাদের রূপসী বর্ণ, কিচ্ছুটি তাই আর জানিনা। তবু সাত সাগর এখনও অধির প্রতীক্ষায় শুনেছি বসে থাকে এসে তাঁদের নিজস্ব একটুকরো সৈকতে, গিরিরাজের মতো নাকি তাঁরা দায় এড়িয়ে চলে যেতে পারেন না।

অবশ্য, তুষারশৃঙ্গের মনের কথা আর কেই বা বুঝেছে বলো কখনও ? তিনি তো তাঁর সাদা জটলাগা কেশরাজির মধ্যেই আজন্ম ধ্যানমগ্ন – তাঁর যে ঝর্ণার উচ্ছ্বসিত ধারায় সিক্ত হওয়া মানায় না। মা, কেউই কি তাহলে কিছু পায় না শেষ পর্যন্ত ? তবু বয়ে চলে অনন্তলীলায় ?

কে জানে এই অমিল মাখা গল্পে, তেরো নদীর তবে কি হল শেষ লগ্নে ? আজ রাতের স্বপ্নে যখন আসবে তুমি মা, ধরে ধরে ছোটবেলার মতো বলে দিও তো সেই কাহিনী সযত্নে !

(সমাপ্ত)

পারিজাত ব্যানার্জী – জন্ম ধানবাদে হলেও লেখিকার আদ্যপ্রান্ত বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বিবিএ, এমবিএ পাশ করে টানা আট বছর কলকাতায় রিয়াল এস্টেটে চাকরি করলেও বরাবরই লেখালেখিতেই তাঁর প্রধান ঝোঁক। ইতিমধ্যেই কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে ছোটগল্প, উপন্যাস এবং কবিতা সংকলন মিলিয়ে তাঁর পাঁচ পাঁচটি বই। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরও বেশ কিছু লেখা। প্রথম পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন অধ্যাপক কবি আব্দুর রসিদ চৌধুরীর স্মরণ প্রতিযোগিতায়। বর্তমানে স্বামী সুমিতাভ'র সাথে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বাস করছেন কর্মসূত্রে।

ধারাবাহিক

গৌরী দত্ত, মনীষা রায়, সুমিতা বসু, সুমিত নাগ

ভান

পর্ব ১

মুখবন্ধ –

কোরোনার এই দুঃসময়ে গৃহবন্দী অবস্থায় প্রায় সকলেরই যখন মনটা ধাঁধাগ্রস্থ, মনের মধ্যে অস্থির-অস্থির ভাব, আবার হঠাৎ "হাতে এখন অনেক সময়, কী করা যায়", এইরকম এক চিন্তার মেঘ লুকোচুরি খেলছে, তখনই তড়াক করে আইডিয়াটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। আচ্ছা, কয়েকজন মিলে একটা গল্প বানালে কেমন হয় ? প্রত্যেকের নিজস্ব টুকরো টুকরো ভাবনার রং দিয়ে সেই গল্পের তরীটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে একটু করে ভাসিয়ে দিতে হবে পাঠক সমুদ্রের দিকে। তাহলে আর দেরি কেন ? যেমন ভাবনা, তেমনি কাজ।

সঙ্গে গল্পের কারিগররাও ছেনি, হাতুড়ি, পেরেক যার যা সংগ্রহে আছে, নিয়ে হাজির। আগে থেকে নিয়মমাফিক পরিকল্পনা কিছু করা হয়নি, একেবারে "ফ্রি ফ্লো" ভাবেই চলুক না হয় আমাদের গল্পের নৌকা। নদীর বাঁকে অর্থাৎ পরিচ্ছেদের অন্তে ও আরম্ভে এক একজন কারিগর কলম তুলি নিয়ে প্রস্তুত। লিখতে বসে বুঝলাম, গন্তব্য জানা নেই। আমরা শুধু সৃষ্টিসুখের উল্লাসে থাকব মত্ত, let's enjoy the journey।

যেহেতু পাকাপাকি পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না কী হবে এই গল্প, কী হবে তার ধাঁচ বা তার ছাঁচ, তাই এইটুকুই বলা, নাও তুলে নাও তোমার কলম, সৃজনীশক্তির পাল দাও খুলে, দেখা যাক কোথায় যায় এই তরী। হয়ত হাওয়ার স্রোতে ভেসে যাবে কোনও ভান-করা বা আদৌ ভান-না করার দেশে।

হলও তাই। আমরা সাতজনা সাতটি রঙে সাজিয়ে তুললাম আমাদের experimental এই project। একেক জনের লেখার পর চলল আলোচনা আর তুমুল তর্ক বিতর্কের ঝড়। আমাদের তরীটি কিন্তু খুব শক্ত পোক্ত। এত জল ঝড়ে নড়লে চড়লেও, দিকভ্রষ্ট হয়নি একটুও। গল্পের গোড়ার কথায়, যে ট্রেন এসে থেমেছিল নদীর কিনারে হাওড়া স্টেশনের ধারে এই গল্পের কারিগরদের তরীতে, তারপর কত ঘাটের জল খেয়ে তা শেষে এসে মিলল সাত লেখকের ছোঁয়ায় সাতরঙা রামধনুর এক দেশে, তৈরি হল এই গল্প "ভান"। পাকাপাকি জায়গা করে নিল "কাগজের নৌকা"য়।

এখানেই গল্প আর গল্পকথার বীজবপনের গল্প। উদ্যোগটি পাঠকদের ভালো লাগলে তবেই আমাদের এই অভিনব প্রয়াস সার্থক।

– সুমিতা বসু

এক – গৌরী দত্ত

ব্যান্ডেল টু হাওড়া লোকাল প্যাসেঞ্জার ট্রেন। লোকাল ট্রেন হওয়া সত্ত্বেও মোটামুটি বেগে চলেছে এতক্ষণ। যানের গতির সঙ্গে মৌলিকের হৃদগতি ছুটছে। সন্ধের আগে বাড়ি পৌঁছতে হবে।

কৃত্তিকা বলেছিল ছেলের ড্রয়িং ক্লাসের জন্য চৌরাস্তার মোড় থেকে ক্রেয়ন বক্স কিনে নিয়ে যেতে। বেশি দেরি হয়ে গেলে অর্কের অধীর ঘ্যানঘ্যান শুরু হয়ে যাবে। তার সঙ্গে শুরু হবে তির্যক বাকশলাকা। অবশ্যই কৃত্তিকার শ্বেতশুভ্র মর্মরকঠিন মুখ থেকে।

ট্রেনের কামরায় মোটামুটি ভিড়। পুজোর বাজার করতে অনেকে কলকাতা যাচ্ছে। কিছু ভাগ্যবান লোক বসার সীট পেয়েছে। অন্যরা সবাই গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে। পাশে শ্রীময়ী মৌলিকের গায়ের সঙ্গে লেপটে দাঁড়িয়ে আছে। ভিড়ের চাপে আর আশ্বিনের আলতো গুমোটে ওর নাকের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম। রাইসপার্লের মত ডেলিকেট, ভাবল মৌলিক। কণ্ঠার উতরাইটা গহ্বর ও ডাংগুলি খেলার ছোট গর্তের মাঝামাঝি। একেবারে ঠিকঠাক। না ফর্সা না কালো গাল থেকে একটা হাল্কা সুগন্ধের ভাপ বেরোচ্ছে, চার পাশের দমবন্ধ করা ঘামের দুর্গন্ধের মধ্যেও।

খুব ভাল লাগছিল মৌলিকের।

আজ সারাদিন কলেজের কাজ আর ক্লাস পালিয়ে চন্দননগর ঘুরেছে ওরা। নন্দদুলাল মন্দির। সেক্রেড হার্ট চার্চ। পাতালবাড়ি। এই বাড়ির সব চেয়ে নিচের তলা গঙ্গা নদীতে নিমজ্জিত। অসাধারণ সুচারু স্থাপত্যের এই বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ বহুবার এসেছেন। কবিতা, গল্প লিখেছেন।

হুগলি নদীর পাশ দিয়ে লম্বা হাঁটা পথ, স্ট্র্যান্ড। খবরের কাগজের তৈরি সরু উল্টো টুপির মত ঠোঙায় ঝালমুড়ি খেতে খেতে অনেকক্ষণ হেঁটেছে ওরা। শ্রীময়ীর হাত ধরার ইচ্ছে ছিল মৌলিকের। কিন্তু ধরেনি। চেনাশোনা জায়গা থেকে দূরে হলেও কোথায় কেউ চেনা যদি দেখে ফেলে ! মৌলিকের কলেজেরই কোনও ছাত্র, হয়ত তারই মত প্রেম করতে কলকাতা থেকে চন্দননগর লুকিয়ে এসেছে।

অবশ্য জানাজানি হলে শ্রীময়ীর যত না হয়রানি হবে তার থেকে অনেক বেশি ঝামেলা হবে মৌলিকের। মৌলিক শ্রীময়ীকে জানায়নি যে সে বিবাহিত। তার একটি পাঁচ বছরের ছেলে আছে। দুজনের মধ্যে আজ প্রায় চার বছরের উপর কোনও দাম্পত্য সম্পর্ক নেই। কোনও ভালবাসা নেই। শুধু হেনস্তা, কর্কশতা, ক্ষোভের এক দৈনিক রুটিন। তবে ছেলেকে ভালবাসে মৌলিক। মাঝে মাঝে মৌলিক যে অন্য নারী সংসর্গ করেনি তা নয়। তবে শ্রীময়ীর ব্যাপারটা যেন অন্য রকম।

ট্রেনের গতি এখন দোদুল্যমান। নাগরদোলার মত। এ ওর ঘাড়ে পড়ে যেতে যেতে টাল সামলাচ্ছে। মৌলিক নিজের কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা একটু শক্ত করে ধরল। কলেজের পড়ানোর সব সরঞ্জাম নিয়েই বেরিয়েছিল সে। ল্যাপটপ, কাগজ, হাইলাইটার, কলম, ফোন, ফোল্ডার। যেন সারাদিন জুওলজির ক্লাস পড়িয়ে, অফিস আওয়ার সেরে বাড়ি ফিরছে। জীবনের অনেকটা বছর ভান করেই কেটে গেল মৌলিকের।

গতকাল মৌলিকের সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল প্রাণী জগতের নানা স্তরের জীবজন্তু কীট পতঙ্গদের মধ্যে বিশিষ্ট যৌনকাণ্ড ও মিলনক্রিয়ার প্রত্যাশায় পুরুষ ও নারী জীবের বিভিন্ন আকর্ষক ইঙ্গিত ও আমন্ত্রণ। যার জীবনে স্বাভাবিক সাহচর্য এবং সুখ বিভ্রান্ত ও বিমুখ, তার এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করার দায় এক অদৃষ্টের পরিহাস মনে হয়েছিল মৌলিকের। ব্যাগের মধ্যে রাখা লম্বা লিগ্যাল প্যাডের কার্ডবোর্ড মাথাটা কোমরের কাছে কড়কড় করে উঠল। কালকের লেকচারের একটা অংশে গঙ্গাফড়িং জিনাসের স্লাইড ছিল। জৈবিক অন্তরঙ্গতার পরেই বা মিলনের সময়েই নারী ফড়িং কপাৎ করে পুরুষটির শিরোচ্ছেদ করে খেয়ে ফেলে। শাপ-বিড়ম্বিত রাজা পাণ্ডুর মতো জৈবিক শীৎকারেই হয় তার জীবনশিকার।

অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার তিন চার মাস পর থেকেই বদলে গিয়েছিল কৃত্তিকা। কথায় কথায় খোঁটা, ঝামটা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কথা বলা সেই যে শুরু হল, তার আর যতি হল না। একটা ছোট কলেজের লেকচারারের মাইনেতে কৃত্তিকার মামাতো দিদি অমৃতার মতো মারুতি ভ্যান হয় না। পুজোর ছুটিতে দুবাই বেড়াতে যাওয়া পোষায় না। পরে আরও উত্তরোত্তর ঠোকা। ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে দিতে যে মুরোদ তার পিসতুতো দাদার আছে, সে আর মৌলিকের কোথায় ! মৌলিক আগে প্রত্যুত্তরে অনেক কিছু বলে গায়ের ঝাল মেটাত। এখন বোঝে যে মৌনতা আরও বড় অস্ত্র ।

ট্রেন এখন অনেকটা মন্থরগামী। হাওড়ার কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। শ্রীময়ীর মুখটা সতিই শ্রী-যুক্ত, ঢলঢলে। আড় চোখে আবার দেখে নেয় মৌলিক। জীবদের মধ্যে সবাই কি আর মক্ষিরাজ্ঞী আর ফড়িংরানীর মতো পুরুষহন্তা হয়। লাভবার্ডসদের মতো চির প্রেম সকলের না থাকলেও সফল সহাবস্থান অনেকের মধ্যে থাকে। সেমিনারে সেদিন অন্যান্য পশুপাখিদের মিলনাত্মক সুন্দর আচারবিধির ব্যাপ্তিও দেখিয়েছিল মৌলিক ।

পুরুষ পেঙ্গুইন পাখি খুঁজে খুঁজে সবচেয়ে মসৃণ নুড়ি পাথর এনে নারী পাখিকে দেয়। পক্ষিণী যদি সেই পাথর নিয়ে একটি গোলাকৃত নীড়ের আঙিনা তৈরি রাখে, তার মানে বুঝতে হবে যে পুরুষ পক্ষীর দেওয়া সেই যৌতুক তার পছন্দ এবং মিলনোত্তর সম্ভাব্য ভাবী সন্তানের জন্য সে বাসা বানাতে ইচ্ছুক। সেমিনারে অন্যান্য ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে শ্রীময়ীও ছিল। লেকচার হলের আধো অন্ধকারে ভাল করে মুখ দেখা যাচ্ছিল না শ্রীময়ীর। জুওলজির খোলাখুলি ভাবে বংশবৃদ্ধির আলোচনায় হয়ত সে অস্বস্তি বোধ করেছিল, মৌলিক দেখতে পায়নি।

আজ চন্দননগর মিউজিয়ামের বাইরের দোকানে একটা খোঁপায় লাগানোর রুপোর কাঁটা দেখেছিল মৌলিক। ইচ্ছে ছিল সেও পেঙ্গুইন হয়ে একটা উপহার দেবে। তবে কাঁটার পিছনে আটকানো লেবেলে দাম দেখে পিছিয়ে গিয়েছিল। যেন রুপোর কারুকার্য নিরীক্ষণ করছে, এই ভণিতা করে অন্য কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আসছে শুক্রবার শ্রীময়ীকে রায়চকে নিয়ে যাবে মৌলিক। শুক্রবার তাদের গোপন অভিসারের বাঁধা দিন। সেদিন একটা কিছু কিনে দেবে অবশ্যই।

ইতস্তত ঝাঁকুনি দিতে দিতে লোকাল ট্রেন হাওড়া স্টেশনে ইন করল। হুড়মুড় করে সব প্যাসেঞ্জার নামছে, উঠছে, ঠেলছে, ধস্তাধস্তি করছে। চিৎকার, ডাকাডাকি, বাচ্চার কান্না, "চায় গরম" ফেরিওয়ালার সুর। ভিড়ের ঠেলায় কখন যে শ্রীময়ী ওর পাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কামরার দরজার দিকে এগিয়ে গেছে, মৌলিক সঠিক বুঝতে পারেনি। সে নিজে দরজার কাছাকাছি যেতে এক তুমুল কলরব শুনতে পেল।

"গেল, গেল –"

"পড়ে গেল –"

"আরে ধর্, ধর্ –"

"কী রক্ত রে বাবা –"

"পুলিশ, পুলিশ কোথায় ? কেউ ডাক্তার আছেন এখানে ?"

"কেউ দ্যাখ্ বাবা মেয়েটাকে –"

মৌলিক হতভম্ব হয়ে দেখে যে প্ল্যাটফর্ম আর ট্রেনের মাঝখানে পা আটকিয়ে পড়ে গেছে শ্রীময়ী। বাঁ পাটা বেকায়দায় বাঁকানো। নিশ্চয়ই কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার বা তার থেকেও যদি কিছু খারাপ থাকে। প্ল্যাটফর্মের উপর পড়াতে মাথায় লেগে গলগলিয়ে রক্ত বয়ে যাচ্ছে। কারা যেন টেনে তুলে প্ল্যাটফর্মে একটা শাড়ি বিছিয়ে শুইয়ে দিয়েছে। মৌলিককে ট্রেন থেকে নামতে দেখে দু-এক জন বলে উঠল, "এই যে, আপনি কি এনার সঙ্গে ? চন্দননগর থেকে এক সঙ্গে উঠেছিলেন না ?"

চকিতে একটা ভয় খেলে গেল মৌলিকের মাথার মধ্যে। অ্যাক্সিডেন্ট, অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ, হাসপাতাল, বন্ড সাইন, সার্জারি, মাথার ক্ষত, ব্রেইন ইনজ্যুরি, প্যারালিসিস, তার দায়, শ্রীময়ীর পরিবারকে জানানো। কৃত্তিকার জেনে যাওয়া। অর্কর ফোলা গাল আর এক মাথা কোঁকড়ানো চুল ভেসে উঠল মনের পর্দায়।

মুহূর্তে নিজেকে দৃঢ় করে ফেলল মৌলিক। ব্যথায় আর্দ্র শ্রীময়ীর চোখ। জ্ঞান হারাবার পূর্বাভাসে ঝিমানো মুখের ভাব। তার চোখে চোখ রাখল না মৌলিক। খুব হাল্কা ভাবে প্ল্যাটফর্মে পা রাখতে রাখতে বলল, "না, চিনি না তো –"

দুই – মনীষা রায়

ট্রেনের গতিটা একটু অন্য রকম লাগছে। গায়ে একটা অস্বাভাবিক ব্যথা, বাঁ পাটা যেন কেটে বেরিয়ে যাবে। মাথাটা শক্ত কিছুর ওপর রাখা, বালিশ নয়। "আমি শুয়ে আছি কেন, একটু আগেও মৌলিকের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম", শ্রীময়ী এসব কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে আবার জ্ঞান হারাল। অল্পক্ষণ পর ওদের ট্যাক্সিটা হঠাৎ ব্রেক কষার ঝাঁকানিতে শ্রীময়ী আবার চোখ খুলল। একটু দূরে এক অচেনা মহিলা ওর পা-দুটো কোলে নিয়ে বসে আছেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে বুঝতে পারল ও এখন আর ট্রেনে দাঁড়িয়ে নেই, একটা গাড়ির পেছনের সীটে আধ শোওয়া অবস্থায় আছে। সামনের সীটে দুজনের মাথা দেখা যাচ্ছে। ওদের দেখার জন্য যেই মাথা তুলতে গেছে অমনি অসহ্য ব্যথার আক্রমণে আবার অজ্ঞান।

যে মহিলা ওর পা-দুটো ধরে বসে, তিনি সচকিত হয়ে বলে উঠলেন, "এর জ্ঞান হয়েছে, অনুপদা শুনছ ?" ঠিক সেই মুহূর্তেই ট্যাক্সিটা একটা ট্র্যাফিক লাইটে থামল। ড্রাইভারের পাশের ভদ্রলোক পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, "কী করে বুঝলে ? একই রকম তো দেখছি।"

"না, না, একটু আগে তাকিয়ে মাথা তোলার চেষ্টা করছিল। হয়ত শরীরের যন্ত্রণায় আবার অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

"মহিলার জ্ঞান ফিরেছে, এটা সুখবর !" সামনের লোকটির গলায় আনন্দের উচ্ছ্বাস।

ড্রাইভার পাশে বসা লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, "হাওড়া জেনারেল হস্‌পিটালটা আমি চিনি। ওটাই সবচেয়ে কাছে হবে, সেখানেই যাব কি ?"

"তাই চলুন," পেছনে বসা মহিলা বললেন।

হাসপাতালে পৌঁছে সামনের সীটের ভদ্রলোক ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন, আমি এঁকে মুভ করার ব্যবস্থা করছি।" বলেই ছুটলেন হাসপাতালের দরজার দিকে।

ইমারজেন্সির অ্যাডমিশনের সেক্রেটারি শ্রীময়ীর স্ট্রেচারটা একজন নার্সের দায়িত্বে দিয়ে কম্প্যুটারে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কি রোগীর আত্মীয় ? অ্যাক্সিডেন্টের সময় উপস্থিত ছিলেন ?"

"আমার নাম বেলা কর্মকার। আমি মহিলাকে চিনি না, তবে ওর সাথে একই ট্রেনে ছিলাম। প্ল্যাটফর্মে প্রথম ওকে পড়ে থাকতে দেখি। ইনি (পুরুষটিকে দেখিয়ে) আমার পরিচিত। ভাগ্যিস প্ল্যাটফর্মে দেখা হয়ে গেল –" ওঁর কথার মাঝেই সেক্রেটারি পুরুষটির দিকে প্রশ্নবোধক চোখে তাকালেন।

"আমি অনুপ সরকার। আমিও মহিলাকে প্রথম দেখি ট্রেন থেকে নামছেন আর সঙ্গে সঙ্গে পা পিছলে রেল লাইনে ঢুকে যাচ্ছিলেন। আমি ঐ ট্রেনটাই ধরব বলে প্ল্যাটফর্মে ছিলাম, তাড়াতাড়ি পেছন থেকে ধরে –"

"অর্থাৎ আপনারা পেশেন্টের নাম, ধাম, টেলিফোন নম্বর কিছুই জানেন না। ওর কোনও হ্যান্ড ব্যাগ ছিল কি ?"

এবার বেলা কর্মকার উত্তর দিলেন, "একটা শোল্ডার ব্যাগ ছিটকে পড়তে দেখেছি, কেউ হয়ত তুলে নিয়েছে।"

লেখার প্যাড এগিয়ে দিয়ে সেক্রেটারি বললেন, "আপনাদের টেলিফোন নম্বর দুটো লিখে দিন।" তারপর হঠাৎ বেলা কর্মকারের শাড়িতে কালো রক্তের ছোপ দেখে একজন অল্পবয়সি নার্সকে ডেকে বললেন, "সাপ্লাই থেকে এঁর জন্য একটা সাদা কোট নয়তো একটা চাদর এনে দিন। এইভাবে রাস্তায় বেরোবেন কী করে !"

"আচ্ছা, মহিলা সেরে উঠবেন তো ?" বেলা কর্মকার জিজ্ঞাসা করলেন।

"ডাক্তাররা আর ভগবান জানেন। আমি ওর আত্মীয়দের আপনাদের ফোন নম্বর দিয়ে দেব, খবর পেয়ে যাবেন।" একটু থেমে সেক্রেটারি বললেন, "জানেন, আপনাদের মতো মানুষ এখনও পৃথিবীতে আছে বলে আমরা আজও বেঁচে আছি। অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার।" দড়াম করে রিভলি্ভং ডোর খুলে তিন চার জন লোক ঢুকল একটি কমবয়সি ছেলেকে ধরে। তার মাথা, মুখ সব রক্তমাখা ভয়াবহ। বেলা কর্মকার পুলিশকে উপেক্ষা করে তাড়াতাড়ি একই দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

রাত এগারোটায় শ্রীময়ীর মা মমতা চৌধুরী মেয়ে এখনও বাড়ি না ফেরায় ভীষণ চিন্তায় পড়লেন। হঠাৎ হাতের কাছে রাখা মোবাইলটা বেজে উঠল। "নির্ঘাৎ শ্রীর ফোন" ভেবে ফোনটা খুললেন।

"হ্যালো, আমি হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল থেকে ফোন করছি, আপনার মেয়ে এই হাসপাতালে আছে। দুজন মানুষ ওকে অজ্ঞান অবস্থায় আজ সন্ধেবেলা এখানে নিয়ে এসেছিলেন। একটু আগে জ্ঞান হয়েছে, আপনার ফোন নম্বরটা আপনার মেয়েই দিল। ওর পায়ে আর মাথায় খুব চোট লেগেছে। ডাক্তাররা দেখছেন, খুব সম্ভবত পায়ে সার্জারি করতে হবে। কাল সকালে আপনি বা আপনার স্বামী এসে কিছু ফর্ম সই করলে ফাইন্যাল ডিসিশন নেওয়া হবে।" খবরটার আকস্মিকতায় মমতা চৌধুরী কয়েক মিনিট থমকে রইলেন, তারপর ছেলে শ্রীকান্তকে বর্ধমানে ফোন করলেন। শ্রীকান্ত দেড় বছর ধরে ওখানকার একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জুনিয়র প্রফেসর। বাবার রিটায়ারমেন্টের স্বল্প আয় ছাড়া ওর উপার্জনেই সংসার চলে। ছোট বোনের কলেজ ও যাবতীয় খরচ দাদাই চালায়। সব শুনে শ্রীকান্ত বলল, "মা, তুমি চিন্তা করো না, মনে হয় ইনজ্যুরি তেমন সিরিয়াস নয়। আমি কাল সকালের ট্রেনেই হাওড়া পৌঁছে হাসপাতালে চলে যাব। বাবাকে এখন কিছু বলার দরকার নেই। অনর্থক দুশ্চিন্তা করবেন। আমি ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে সব বুঝিয়ে বলবো। তুমি এবার শুয়ে পড়। অনেক রাত হয়েছে।"

ছেলের কথায় একটু স্বস্তি পেলেও সহজে ঘুম আসতে চায় না। ঘুমন্ত স্বামীর পাশে শুয়ে বড় একা লাগছে হঠাৎ। যে মানুষটা তিরিশ বছরের বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর সব কথার মূল্য দিয়েছেন, আজ আলসাইমারের সূচনায় তাঁর সঙ্গে কোনও আলোচনা সম্ভব নয়। প্রায় দশ বছর আগে আসামের "বাঙালিখেদা" আন্দোলনের দাপটে নাবালক ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। তারপর অনেক ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে এক আত্মীয়ের সাহায্যে উত্তর কলকাতার ছোট একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে আছেন। ভাগ্যক্রমে স্বামী রাইটার্স বিল্ডিং-এ একটা ক্লার্কের চাকরি পেয়েছিলেন। অতি কষ্টে ছেলে-মেয়েকে মানুষ করেছেন। আর এখন এই দুর্ঘটনা ! মেয়ের বাবা জানলে তো পাগল হয়ে যাবে। এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুম এসে গেল।

পরদিন কলেজ থেকে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে শ্রীকান্ত হাওড়া পৌঁছেই হাসপাতালে গেল। অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ান ডঃ অলকা মিত্র ওকে জানালেন যে রোগীকে আপাতত সিডেটিভ দিয়ে রাখা হয়েছে, ওঁর সঙ্গে জরুরি কথা হয়ে গেলে দেখা করতে পারবে। শ্রীকান্ত কিছু ফর্ম সই করল এবং ডাক্তারকে জানাল চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত খরচের দরকার হলে ও ব্যবস্থা করবে।

"ডঃ মিত্র, আমার বোনের প্রগ্নোসিসটা আমাকে প্লীজ বলবেন ?"

"আপনার বোনের বয়স কম, স্বাস্থ্য ভাল, prognosis favorable and luckily C.T. Scan-এ ব্রেইনে কোনও abnormality পাওয়া যায়নি। তবে সুস্থ হতে সময় নেবে।" ডঃ মিত্র শ্রীকান্তকে শ্রীময়ীর ঘরের দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজের কাজে চলে গেলেন।

আদরের বোনের ব্যান্ডেজ বাঁধা পা, মাথা এসব দেখে আর তার অতি দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনে শ্রীকান্তের চোখে জল এসে গেল। অনেক চেষ্টায় সামলে নিয়ে নিজের দু'হাতের মধ্যে শ্রীময়ীর একটা হাত ধরে বলল, "আজ বিকেলে মাকে নিয়ে আসব। ডাক্তার বলছেন সব ঠিক হয়ে যাবে। একদম চিন্তা করিস না, কেমন ? তোর কিছু লাগবে ?"

"আমার ব্যাগটা চুরি হয়ে গেছে। দা'ভাই, তোর মোবাইলটা ধার দিবি ?" মৃদুস্বরে বলল শ্রীময়ী। বোনের এই আবদারে খুশি হয়ে দাদা পকেট থেকে তার মোবাইলটা বার করে দিল। শ্রীকান্ত বাথরুমে যাবার জন্য বেরিয়ে যাওয়া মাত্র শ্রীময়ী মৌলিককে ফোন করল। কিন্তু কেউ ধরল না।

পরদিন সকালে ডঃ অলকা মিত্র হাল্কা নক করে ঢুকলেন, বিছানার পাশে বসে রোগীর একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে নরম সুরে বললেন, "আপনার লাস্ট পিরিয়েড কবে হয়েছে মনে আছে ?" শ্রীময়ী একটু চিন্তা করে বলল, "ঠিক মনে করতে পারছি না। কেন ?"

"আপনি খুব সম্ভবত pregnant। ইউরিন টেস্টে তাই দেখছি।" শ্রীময়ী চোখ নামিয়ে চুপ করে গেল। অলকা মিত্র আস্তে আস্তে বললেন, "আপনার দাদার সঙ্গে কথা বলে মনে হল আপনি অবিবাহিত। তাই ওঁকে আমি কিছু বলিনি।"

তিন – সুমিতা বসু

Pregnant! বুকের মধ্যে একটা ঠান্ডা বরফের স্রোত বয়ে গেল শ্রীময়ীর। এত সাবধানতা সত্ত্বেও ? এই কয়েকবার সহবাসেই ? মৌলিকের সাবধানতা প্রায় ম্যানিয়ার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। পরিষ্কার মনে আছে, একবার আনন্দময় নিভৃত অন্তরঙ্গ মুহূর্তে মৌলিক তার কানের কাছে ফিসফিস করে বলেছিল, "কিচ্ছু ভয় নেই শ্রী, সবরকম protection নিয়েছি।" ঘটনার আকস্মিকতা, শারীরিক অসহ্য যন্ত্রণা, সন্তানসম্ভাবনার সংবাদ ছাপিয়েও সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেল। শ্রীময়ী তো মনে মনে জানত যে তার নিজেরও অদম্য শরীর শরীর খেলার নেশায় কিছু না কিছু অঘটন ঘটতেই পারে। তার নিজের অতি পরিচিত নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের জন্য যে খুব একটা পরোয়া করে তা নয়, তবু মায়ের সাবেকি বিশ্বাসটাকে ফুৎকার দিয়ে উড়িয়ে দিতেও বাধে। তাহলে ? কী করবে সে ?

ওরা বলেছে ক্যাটস্ক্যান-এ মাথার ভিতরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি, কিন্তু যন্ত্রণায় মাথা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় যে ভাবে হোক মৌলিকের সঙ্গে কথা বলা দরকার। সেও নিশ্চয়ই শ্রীময়ীর জন্য দারুণ দুশ্চিন্তায় আছে। সেদিন কী ভাবে সে পড়ে গেল, তারপর কী করে এই হাসপাতালে এল, মৌলিক কোথায় গেল – সবই এখনও ভাসা ভাসা হেঁয়ালির মতো লাগছে। কিন্তু এসব ছাপিয়ে "সন্তানসম্ভবা" শব্দটা তাকে একই সঙ্গে দিশেহারা আর আচ্ছন্ন করে দিল।

ছোটবেলায় শুতে যাবার আগে বিছানার পাশে বসে মা তাদের মহাভারত পড়ে শোনাতেন রোজ রাতে। সেই আকর্ষণে নিজেও পরে অনেকবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছে মহাভারত। নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকায় না পড়লেও, ঠিকমত ঘাঁটলে মনে হয়, মহাভারতের মত প্রাপ্তবয়স্ক বই আর বুঝি দুটো নেই। গল্পগুলোয় কত layer, পরতে পরতে যেন ভাঁজ খোলে। শ্রীময়ীকে সব থেকে টানত সত্যবতী, কুন্তী আর সত্যভামা। এরা নিজেদের রূপ যৌবনের কড়ায় গণ্ডায় সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে। মনের আর শরীরের চাহিদার কাছে কিচ্ছু পরোয়া করেনি। হাওড়ার হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে এত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও শ্রীময়ী তার প্রিয় চরিত্রগুলোর সঙ্গে নিজের যেন কোথাও একটা অবিশ্বাস্য মিল খুঁজে পেল – একা একা। ঝিম ধরছে। হয়ত কড়া ওষুধের কারণে। কাঁচুলিপরা টান টান চেহারার সত্যবতী নৌকো বাইছে, চোখে মুখে লাস্য। পরাশর মুনির সমস্ত শরীর জুড়ে জ্বলছে ধিকি ধিকি কামনার আগুন। মাঝদরিয়ায় মৃদুমন্দ বাতাস আর কেউ কোথাও নেই। সত্যবতী উপভোগ করছে মুনির এই অযাচিত অথচ অপ্রতিরোধ্য কামনাসিক্ত অভিলাষ, কানের পাশে উষ্ণ নিঃশ্বাস। সত্যবতী ? নাকি শ্রীময়ী নিজে ?

শ্রীকান্তর গলার আওয়াজে তন্দ্রা ভাঙল শ্রীময়ীর।

"কী রে, ঘুম হয়েছিল রাতে ? এখনও ঘুম পাচ্ছে ? যন্ত্রণা কেমন আছে ? খেয়েছিস কিছু সকাল থেকে ?" এক নিঃশ্বাসে শ্রীকান্ত কথাগুলো বলে হাঁফাতে লাগল। উস্কোখুস্কো চুল, উদ্ভ্রান্ত মুখ আর খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফে শ্রীকান্তকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

"ভীষণ যন্ত্রণা রে দা'ভাই, ভেঙ্গেছে, না রে ? মাথায়ও খুব ব্যথা।"

"হ্যাঁ, তাই তো বললেন ডঃ মিত্র, পায়ে মেজর সার্জারি। তাছাড়া মাথার আঘাতটা একটু সময় লাগবে, তবে ভয়ের কিছু নেই, এটাই একটা ভালো খবর। শোন, আরো কিছু টেস্ট নাকি করতে হবে।" শ্রীময়ী পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শ্রীকান্তর হাতটা আলতো করে ধরল।

"এ কি রে, তোর হাত এত ঠান্ডা কেন ? বোকা মেয়ে, শুধু শুধু ভয় পাচ্ছিস, আমরা সকলে আছি তো, ঠিক হয়ে যাবি তাড়াতাড়ি। তোর আর তো কোনো সমস্যা নেই, চিন্তা করিস না।"

"মা কি আসবে ? হ্যাঁরে, দা'ভাই, বাবা জানে ? বুঝতে পেরেছে ?" একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে শ্রীময়ীর দম শেষ হয়ে গেল।

"চুপ, কথা বলিস না এত।" খুব যত্ন করে শ্রীময়ীর মাথায় হাত বোলাতে লাগল শ্রীকান্ত। "মাকে বিকেলে আনব, সকালটায় বাড়ির এত কাজ থাকে, জানিসই তো। ও, আচ্ছা", একটু থেমে আবার বলল, "মনে হয় তুই আমার ফোন থেকে সেদিন যাকে ফোন করেছিলি, সেই নম্বর থেকে দু'বার ফোন এসেছিল। আমার গলা শুনে ইচ্ছে করে কেউ যেন কেটে দিল। আমি পরে নম্বরটা মিলিয়ে দেখলাম। আরও ইন্টারেষ্টিং কি জানিস, আমি আবার কল ব্যাক করতে, তুলল, কিন্তু বুঝতে পারছি চুপ করে আছে। কে বলতো ? কাকে কল করেছিলি ?"

শ্রীময়ীর মুখটা যে লজ্জায় ভয়ে উৎকণ্ঠায় লাল হয়ে গেছে, শ্রীকান্ত এই পরিবর্তনটা খেয়াল করল। কিন্তু তার "বোঝা" আর শ্রীময়ীর "হওয়া"র মধ্যে এই মুহূর্তে আকাশ পাতাল তফাত। শ্রীময়ীর বুকের মধ্যে সুনামি আর কানের কাছে সব ছাপিয়ে বাজছে ডঃ মিত্র-র গলা ... urine test-এ যে দেখা যাচ্ছে ... আর কিছু মনে নেই।

"সিস্টার সিস্টার, একবার আসুন, একি – একি অজ্ঞান হয়ে গেল নাকি!" শ্রীকান্তর চিৎকারে দুজন সিস্টার ছুটে এল, পিছন পিছন ডঃ অলকা মিত্র।

"ডঃ মিত্র, ও আর ব্যথা সহ্য করতে পারছে না, কিছু একটা করুন, প্লীজ।"

*** ***

মৌলিক কোনও রকমে ছুটে ছুটে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে স্টেশনের বাইরেই চলন্ত একটা যাদবপুরগামী মিনি বাসে উঠে পড়ল। দুর্ঘটনা না হলে ওরা হয়ত হাঁটতে হাঁটতে হাওড়া ব্রিজটা পেরিয়ে বাগড়ি মার্কেটের কাছে এসে দুজনে আলাদা বাসে উঠত। সন্ধ্যের আবছা আলোয় কলকাতার ভিড়ে ওদের চেনা মুশকিল তবু একসঙ্গে চলার সময় শ্রীময়ী তার ওড়নাটা দিয়ে মুখ মাথা ঢেকে নিত প্রতিবার। মৌলিক ঠাট্টা করে কতবার বলেছে, "বা রে, ঘোমটা দিলে তোমায় আরো সুন্দর লাগে।" আজ অবশ্য মৌলিকেরই বাড়ি ফেরার তাড়া থাকার দরুন একটু তাড়াতাড়ি বিকেল বিকেলই ফিরছিল ওরা।

ভয় আর লজ্জা একই সঙ্গে মৌলিককে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরেছে। কী হলো শ্রীময়ীর ? কী করে হল ? এরপর কী হবে ? সবই ধোঁয়াশা। এইভাবে পালিয়ে আসাটা কি ঠিক হল ? সমাজ, পরিবার, কলেজ – জানাজানি – এটাই কি ঘটনাকে বেমালুম অস্বীকার করার একমাত্র কারণ ? পড়ে গিয়ে একটু কাটাকাটি ছাড়া আরও বড় কিছু হয়নি তো শ্রীময়ীর ? তাহলে তো পুলিশ-তদন্ত, কেঁচো খুঁড়তে কোন সাপ যে বেরোবে ! মৌলিকের সমস্ত শরীর জুড়ে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে।

মিনিবাসের পেছন দিকে একটা জায়গা পেয়ে মৌলিক বসে পড়ল। এখনও বুকটা ধুকপুক করছে, শ্রীময়ীর রক্তমাখা অসহায় চেহারাটা চোখের সামনে। আজ তাদের ঘোরাটা ছিল বাইরে বাইরেই কিন্তু গত সপ্তাহে দমদমের কাছে একটা হোটেল-ঘরে কাটিয়েছে অন্তরঙ্গ আনন্দঘন সারাদিন। তারও আগে আরও বার কয়েক। শারীরিক মিলনের একান্ত অন্তরঙ্গ মুহূর্তে কাটখোট্টা প্রফেসর হয়েও নিজের অজান্তেই শ্রীময়ীকে "শ্রী" বলে ডেকেছিল। শ্রীময়ী লজ্জায় আনন্দে যখন থরথর করে কাঁপছিল এই নতুন নামে, শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মৌলিকের মনটাও ভরে উঠেছিল টইটম্বুর। এ অভিজ্ঞতা তারও নতুন। সেই শ্রীকে, এই অবস্থায় ফেলে কী করে পালিয়ে এল সে ? নিজের কাছেই জবাবদিহির কোনও ভাষা নেই তার।

বেঁচে আছে তো ? কথাটা ভাবতেই হাত-পা অবশ হয়ে এল মৌলিকের। এত রক্তগঙ্গা ! আবার কি ফিরে যাওয়া উচিত ? নিজেকে পাঠ্যসূচীর সেই গঙ্গাফড়িং-এর মতো লাগছে। জৈবিক অন্তরঙ্গতার পরে পরেই বা মিলনের সময়েই নারী ফড়িংটা যেমন কপাৎ করে পুরুষটির শিরোৎপাটন করে খেয়ে ফেলে। তুলনাটা ঠিক একরকম হল না, এক্ষেত্রে সেই যেন নারী ফড়িং। ততক্ষণে বাসটা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল পেরিয়েছে।

অনেকগুলো চিন্তা একসঙ্গে ছেয়ে ফেলল মৌলিককে। কৃত্তিকা ও তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের প্রহসন, অর্কর আঁকার নতুন প্রজেক্টের জন্য আজই ক্রেয়ন বক্সের আবদার, কলেজের চাকরি যা জীবনের ঝড়-জল-বৃষ্টিতে সামান্য এক ছাতা, শ্রীময়ীকে ঘিরে একটু একটু করে হয়ত অলীক স্বপ্নের বীজ বোনা – যা প্রেম আর নারীসুখের থেকেও একটু যেন বেশি। একটা নিরাপত্তা।

এর মধ্যে হঠাৎ মায়ের মুখটাও এল ভেসে। দুর্গাপুরে দাদার পাখির বাসার মতো ছোট্ট কোয়ার্টারে কোনও মতে দিনগত পাপক্ষয় টিকে থাকা মায়ের সদা করুণ মুখ। তাচ্ছিল্য ও দুরবস্থার মধ্যে মায়ের দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধের অবসান কোনদিনই ঘটাতে পারবে না মৌলিক, তবু মাসান্তে হাতে হাজার দু'হাজার টাকা তুলে দিতে পারাও তার কাছে কোজাগরী জোৎস্নার মতোই শান্তিদায়ক। কিন্তু সব ছাপিয়ে শ্রীময়ীর অসহায় রক্তমাখা প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকা যন্ত্রণাকাতর মুখটাই ভাসছে চোখের ওপর। কী করে এই সাংঘাতিক ঘটনা থেকে পালিয়ে এল সে ?

হঠাৎ খেয়াল করল বাসটা এতক্ষণে হাজরার মোড় পেরিয়ে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির দিকে চলছে। সারা জীবনটাই তার ভান করে কাটল, হয়ত তাই হাওড়া স্টেশনের এই ঘটনায় দক্ষভাবে মিথ্যে কথা বলতে একটুও আটকাল না। এতদিন জীবনে ছোটখাটো ভান করা ঘটনা, সম্পর্ক, অনুভূতিগুলো বিশেষ পাত্তা পায়নি তার কাছে। মৌলিক নিজেই অবাক হল, শ্রীময়ীর ভাসা ভাসা চোখদুটো যেন তার অন্তরের গভীরে স্বচ্ছ হ্রদের জলের মত অকপটে সব দেখতে পাচ্ছে। সব। এবার ?

আর মাত্র কয়েকটা স্টপ, তারপরই ব্রিজের স্টপ-এ নেমে সেলিমপুরের দিকে হাঁটা দিতে হবে মিনিট পনেরো। মৌলিকের মনে হল, এই নামাটা তো শুধু বাড়ি নামক বাসস্থানের জন্য নামা নয়, এ নামা বাস্তবিকই রূঢ় বাস্তবতায়। কালকেই হয়ত কলেজে শ্রীময়ীর অ্যাক্সিডেন্টের খবর ছড়িয়ে পড়বে। মুহূর্তে মনস্থির করে নিল সে, নাহ্, সব কিছু অক্লেশে এক কথায় অস্বীকার করতে হবে। যা ঘটেছে সে তার কিচ্ছু জানে না, এইমাত্র অন্যদিনের মতই সে কলেজ ফেরত বাড়ি ফিরছে। ব্যস।

চার – সুমিত নাগ

পাড়ার মোড়ের দোকান থেকে এক বাক্স ক্রেয়ন কিনে মৌলিক যখন বাড়ি ঢুকল, তখন রাত প্রায় আটটা। অন্যান্য দিনের থেকে একটু দেরিই বলা যায়, তাই কৃত্তিকা যে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে, তা ভেবে মৌলিক মনে মনে তৈরি ছিল। কিন্তু ওর হাতে ক্রেয়নের বাক্স দেখে অর্ক যে ভাবে দৌড়ে এসে ওর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তা দেখে কৃত্তিকা শুরুতেই বিষোদ্গার করার অবকাশ পেল না। সেটা আরম্ভ হল প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে, অর্ক ঘুমিয়ে পড়ার পরে।

"তোমার কি কলেজ ছুটির পরে এক দিনও ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না ? সেই দেরি করে ঢুকলে ? ছেলেটা ঘুম পেলেও কষ্ট করে এতক্ষণ জেগে রইল ঐ ক্রেয়নের আশায়। এত ইনসেনসিটিভ্ তুমি, একবারও মনে হল না যে, কালকে ওর হোমওয়ার্কে কালারিং করতে ক্রেয়নগুলো লাগবে ? সব কিছু শেষ করে ঘুমোতে যেতে বেচারার কত রাত হয়ে গেল। ভাবতেই পারি না তুমি কী করে এতটা ইর্রেরসপনসিব্ল হয়ে গেলে ?"

কিছু দিন আগে মৌলিকও গলা চড়িয়ে দুটো কথা শুনিয়ে দিত। এখন মৌনতাই তার অস্ত্র। এই সুযোগে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল সে। লম্বা একটা টান দিয়ে ভাবতে শুরু করল পেঙ্গুইন নিয়ে লেখা একটা পেপারের কথা, যেটা খুব সম্প্রতি ও সায়েন্টিফিক অ্যামেরিকান-এ পড়েছে। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে পারল না। আজকের দিনটা ভীষণ রাফ্ গেছে, তাই অনেক চিন্তাই এলোমেলো ভাবে এসে একটা অন্যটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

না, চিনি না তো ! না, চিনি না তো !

এই চারটি শব্দ বারবার মাথার ভিতরে আঘাত করছে। নিজের গলাকেই বিশ্বাস করতে পারছে না মৌলিক। সে তো সত্যিই শ্রীময়ীকে ভালবাসে, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। হ্যাঁ, সম্পর্কটা একটা মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই। কিন্ত তার জন্য ও নিজেও কম অনুশোচনায় ভোগে না। খুব ছোটবেলায় খুব সাধারণ তুচ্ছ একটা মিথ্যে কথা বলার জন্য

বাবার কাছে শাস্তি পেয়েছিল। পরে বাবা বুঝিয়ে বলেছিলেন, "জানিস তো, প্রথমেই সত্যি কথাটা বলে ফেলা ভীষণ শক্ত। কিন্তু একবার বলে ফেললে তারপরে আর যে সব প্রসঙ্গ আসে, সেগুলো ভারি সহজ হয়ে যায়।" সিলিং ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে ওর হঠাৎ মনে হল, সত্যি কথাটা এভাবে আর হয়ত বেশি দিন ঢেকে রাখা যাবে না, শ্রীময়ী আর কৃত্তিকা, দুজনেরই কাছে। আজীবন ভান করে করে সে আজ সত্যিই বড় ক্লান্ত। কৃত্তিকা তখনও অবিরাম বলে চলেছে।

"সংসারটা কীভাবে আমি চালাই তা বোঝারও তো চেষ্টা কর না। বাজার করা, রান্না করা, ঘর পরিষ্কার করা, বুবাইকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া, স্কুল থেকে নিয়ে আসা – সব আমি করি। আমার শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে। কাজগুলো করে দেবার জন্য পয়সা দিয়ে যে কাউকে রাখবে, সে মুরোদও তো নেই।"

কৃত্তিকার বাক্যবাণ আজ চট করে থামবে না। মৌলিক ছোট একটা প্রাইভেট কলেজের কনিষ্ঠ লেকচারার। লোকে ভাবে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস্ কমিশনের দৌলতে ওদের এখন অনেক মাইনে। কিন্তু ক'জন জানে যে এই প্রাইভেট কলেজগুলি কন্ট্র্যাক্টে ওদের খুব কম মাইনেতে হায়ার করে আইন বাঁচিয়ে ? তাই সংসার চালাতে সেই সুদূর টাকিতে আরও একটি কলেজে সে সপ্তাহে এক দিন পার্ট-টাইম পড়াতে যায়। টাকিতে যেদিন পড়ানো থাকে সেই দিন সকাল সাতটায় বেরিয়ে বাড়ি ফেরে রাত এগারোটায়। সেই সব দিন তো অর্কর সঙ্গে দেখাই হয় না।

সমুদ্রের রুপালী শস্য শিকার করতে একটা পেঙ্গুইনকেও হাজার হাজার মাইল সাঁতার কেটে বহু দূরে যেতে হয়। ঘরে ফেলে আসা ছানাপোনারা একলা অভুক্ত পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে নিজেকে সেই সব হতভাগ্য পেঙ্গুইনদেরই একজন বলে মনে হয়।

শ্রীময়ী নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হয়েছে। পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দ্রুত দাঁড়াতে হবে এটাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। ওর সব চেয়ে কাছের বান্ধবী অরুণিমা তখন চুটিয়ে প্রেম করছে নীলাঞ্জনের সঙ্গে। ওরা তখন ক্লাস ইলেভেনের ছাত্রী। নীলাঞ্জন ফার্স্ট ইয়ার একই কলেজে। অরুণিমা ও নীলাঞ্জন মাঝেমাঝে ক্লাস কেটে দূরে কোথাও চলে যেত ট্রেনে বা বাসে। ফিরে এসে পরের দিন অরুণিমা ক্লাসের মধ্যেই কানের কাছে ফিসফিস করে গল্প শোনাত। কোনও কোনও গল্প শুনে সারা শরীর ভাসিয়ে একটা দারুণ ভাল লাগার অনুভূতি হত শ্রীময়ীর। মনের মধ্যে তখন খালি নীলাঞ্জনের মুখটাই ভেসে উঠত।

শ্রীময়ী তখন একটি জীবজন্তু সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। রাস্তার আহত কুকুর আর বিড়ালদের উদ্ধার করাই ছিল ওদের কাজ। আর মৌলিক তখন পৃথিবীর বুক থেকে পেঙ্গুইনদের দ্রুত বিলুপ্তি নিয়ে পড়াশোনা করছে। মৌলিক এ বিষয়ে কিছু প্রবন্ধ লিখেছিল সে সময়। উষ্ণায়ন আর দূষণের জন্য পেঙ্গুইনকে এখন খাদ্যের সন্ধানে বাড়ি ছেড়ে কাটাতে হয় বহু দিন। অনেকেই আর নিজেদের সন্তানসন্ততিদের কাছে ফিরে আসতে পারে না। তার আগেই মৃত্যু হয়। তাই পেঙ্গুইনদের বাঁচাতে উষ্ণায়ন আর দূষণ দুটোই কমাতে হবে। তাতে ওরাও বাঁচবে, এবং স্বভাবত মানুষও।

দুজনের এই সংরক্ষণশীল মনন হয়ত একে অন্যের কাছে নিয়ে এসেছিল। তবে মৌলিক আর শ্রীময়ী যেদিন এক সঙ্গে ডায়মন্ড হার্বার বেড়াতে গিয়ে একটা সস্তা হোটেলে কয়েক ঘন্টার জন্য চেক ইন করল, সেদিন আর কোনও রক্ষণশীলতাই বাধা হয়ে ওঠেনি।

মানুষ ছাড়া জীবজন্তুকুলে আর সবারই মেটিং সিজন বলে একটা বস্তু আছে। যেহেতু দুই সিজনের মধ্যবর্তী সময়ে খাদ্যের সন্ধানে একটি পেঙ্গুইনকে বহু দূরে যেতে হয়, তাই পরের মেটিং সিজনে ফিরে এসে আগের বারের পার্টনারের সন্ধান নাও পেতে পারে। পুরোনো পার্টনার হয়ত হারিয়ে গেছে কিংবা মারা গেছে, তাই আর ফিরবে না। তখন শুরু হয় নতুন সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পালা। প্রাণী জগতে এর নাম ডিভোর্স।

রেডিও ট্র্যান্সমিটার ট্যাগের মত আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে একটি পাখির উপর সারা জীবন ধরে লক্ষ্য রাখা যায়। একটি পেঙ্গুইন এই সিজনে কার সঙ্গে মেটিং করছে, আর পরের সিজনে তার সঙ্গী বদলেছে কি না, তা সহজেই যাচাই করা যায় এখন। এর থেকে ডিভোর্সের হারও গণনা করা যায়, যা প্রায় চল্লিশ শতাংশের কাছাকাছি। এম্পারার পেঙ্গুইন তো ৮৫

শতাংশ হারে সঙ্গী পালটায়, যা মানুষের ডিভোর্স রেটের থেকেও অনেক বেশি। আর একটি পেঙ্গুইন দম্পতির দুজনেই যদি একই সময়ে ঘরে ফিরে আসে তাহলে ডিভোর্সের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। দুজনের মধ্যে যদি একজন আগে ফেরে, তাহলে সে কতক্ষণ অপেক্ষা করবে সঙ্গীর জন্য ? এদের মর্টালিটির হার খুব বেশি, তাই মেটিং সিজন শেষ হবার আগেই অন্য সঙ্গীর ফিরে আসার সম্ভাবনাও খুব কম। স্বভাবতই যে আগে ফিরে এসেছে, সে অন্য কারও সঙ্গে মিলিত হয়, ঘর বাঁধে।

প্রাণীবিজ্ঞানীরা এটাও দেখেছেন যে দুজনেই যখন হাজার হাজার মাইল দূরে খাদ্যের সন্ধান চালাচ্ছে, তখন যদি তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখে তাহলে দুজনেরই একসঙ্গে ফিরে আসার সম্ভাবনা খুব বেশি। তখন ডিভোর্স এড়ানো যায়। মানুষের ক্ষেত্রে এর নাম কম্যুইনিকেশন। যার কিছু সুমধুর নমুনা সেই মুহূর্তেই মৌলিকের কানে ভেসে এল।

"তোমার মত সেলফ্-সেন্টার্ড মানুষ আমি দুটো দেখিনি। আমি বলেই সব টর্চার মুখ বুজে সহ্য করে চলেছি বছরের পর বছর। আর তুমি সবাইকে নেগলেক্ট করে বাইরে ফূর্তি করে রাত করে বাড়ি ফেরো।"

মৌলিক তখনও শুধু শুনে যাচ্ছে। মানুষ কেন ডিভোর্স করে, তা ব্যাখ্যা করা যেমন জটিল ব্যাপার, পাখিদের ডিভোর্সের ক্ষেত্রেও তা সমান ভাবে প্রযোজ্য। ডিভোর্স করার যেমন কিছু পজিটিভ বেনিফিট আছে, তেমনি নেগেটিভ কস্ট্-এর পাল্লাও কম ভারি নয়। বহু দিনের চেনা কারও সঙ্গে থাকার মধ্যে কিছু সুবিধা তো আছেই। কিন্তু শারীরিক ও মানসিক সান্নিধ্যের অভাব যে কী যন্ত্রণাময়, তা কি কৃত্তিকা এতটুকুও বোঝে না ? সমাজ-বিজ্ঞানীরা বলেন, ডিভোর্সের জন্য অন্তত একজন সঙ্গীর বেনিফিট কস্ট্-এর চেয়ে বেশি হতে হবে। যে কোনও সেরিব্রাল মানুষের মনে এই কস্ট্-বেনিফিট অ্যানালিসিস চলতে থাকে প্রতিনিয়ত, যে কোনও সিদ্ধান্ত নেবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। জীবন সত্যিই খুব ছোট, তাই প্রতিটি মুহূর্ত খুব দামী। মৌলিক হঠাৎ কৃত্তিকার খুব সামনে এসে দাঁড়াল। ওর চোখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে। তারপর স্থির গলায় বলল, "কৃত্তিকা, আই ওয়ান্ট আ ডিভোর্স।"

(চলবে)

গৌরী দত্ত – প্রবাসের কৈশোরে মুকুলিত, অভিবাস জীবন ঝড়ে আন্দোলিত। কিছু লেখার স্বপ্ন গৌরীর মধ্যে বহুদিন ধরে বৈশাখীর আমের মত দুলেছে। এই স্বপ্নের জন্যেই "লেখনী" ধরা, বহু মনস্তাত্ত্বিক কাজের মধ্যেও সমমনস্কদের সঙ্গে গল্প, কবিতা সৃষ্টির জন্য পথ চলা। ইংরাজি আলেয়া, হিন্দী মরীচিকা বা বাংলা সোনার হরিণ – "যার পিছনেই ছুটি না কেন – সৃজন চাই, সৃজন হোক।"

মনীষা রায় – নৃতত্ত্বে ডক্টোরেট এবং সুইস সাইকাইট্রিষ্ট কার্ল য়্যুং-এর প্রবর্তিত অ্যানালিটিক্যাল সাইকোলজিস্ট, বর্তমানে বস্টনের পাশে কেমব্রিজ শহরে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন দুই বিষয়েই। তাঁর লেখা ও সম্পাদিত এগারোটি গ্রন্থের একটি Bengali Women অ্যামেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য। তাঁর বাংলা আত্মজীবনী "আমার চার বাড়ি" (মিত্র ও ঘোষ, ২০০১) এবং ছোট গল্পের সংকলন "সুলতার প্রশ্ন এবং অন্যান্য গল্প" (প্রতিভাস ২০০৮) ছাড়াও একটি উপন্যাস, বেশ কিছু বাংলা গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। ইংরেজিতে তাঁর আরও ছ'টি বই, একটি উপন্যাস ও চল্লিশের ওপর প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। মনীষা রায় স্বামী কার্ল ভন্ এসেন সহ কেমব্রিজে বসবাস করেন। কার্ল অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার এবং লেখক।

সুমিতা বসু – বর্তমানে হিউস্টন টেক্সাস-এ বাস। এর আগে বস্টনে কেটেছে দুই দশকেরও বেশি। বিদেশে কেটে গেল বহু বছর আর নিত্যদিনের কাজের সূত্রে সম্পূর্ণ অন্য অভিজ্ঞতা হলেও, মনের ভেতর নাড়া দেয় মাতৃভাষা। তাই নিয়মিত সাহিত্য চর্চা বাংলাতেই। ছোটগল্প, কবিতা আর প্রবন্ধ – স্বচ্ছন্দ বিচরণ। বেশ কিছু বইয়ের সম্পাদনার কাজও করেছেন, অনেকদিন বই প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত।

সুমিত নাগ – গাণিতিক অর্থনীতির মডেলিং করা পেশা, মাঝে মাঝে সাহিত্য চর্চা নেশা। গদ্য লিখতেই বেশি ভালবাসেন, বিশেষত গল্প ও প্রবন্ধ। উত্তর অ্যামেরিকা ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় অনিয়মিতভাবে লিখে থাকেন।

ধারাবাহিক

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

চল নিধুবনে

পর্ব ১

এই গাছটাই শহরের সীমানা। তারপরেই নদী। নদী পেরোলেই পৌঁছে যাবে নবীনা সেই নগরে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। হয়ত ভিজে যাবে ও। বৃষ্টি থেমেও যেতে পারে ।কেননা মেঘটা খুব ছোট। ওকে ভেজানোর জন্যই এসেছে। ছাতা নেই, মাথায় ওড়না দিয়ে ঘোমটা দেয় নবীনা।

ঠিক তখনই কুয়াশা নেমে আসে। এ কুয়াশার রঙ হলুদ। সাদা নয়। কুয়াশায় চারপাশ ঢেকে যায়। প্রথমে গাছপালা, পথ কিছুই দেখতে পায়না ও। তারপর আলো ফুটে ওঠে। শুধু টের পায় হাঁটছে। একদম একা হেঁটে চলেছে। অনেকটা পথ এখনও যেতে হবে ওকে।

বৃষ্টি আর ভেজায় না। কুয়াশা সরে যায় ধীরে ধীরে। এখন শরীর হাল্কা। মাথায় কোনও ঘোর নেই। সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। চারপাশে বড় বড় গাছ। তার মাঝে পথ। সেই পথে এখনও হাঁটছে নবীনা। কতক্ষণ যে ওই ঘোরের মধ্যে ছিল জানেনা। ঝিমুনি কেটে গেলে শরীর নিজেই জানান দেয়। সারা শরীর ঘামে দরদর করে ভিজে যায়। যেমন ঘোর আসার আগেও ওর মাথা ঝিমঝিম করে। চোখ বুজে আসে। তখন নিজেকে একদম ছেড়ে দেয়। যা ঘটার তাই ঘটে।

আবার তাকিয়ে দেখে নবীনা। বোঝার চেষ্টা করে। না, এখনও বেশ কিছুটা পথ বাকি।

আরশিনগরে যাওয়ার পথে পাশে জঙ্গল পড়ে। সেটা শেষ হতেই লাল সুরকির রাস্তা, পেরোলেই কালো পাথরের ঢিবি। ডিঙিয়ে গেলেই সাধারণ পায়ে চলা পথ। তারপরেই ভাঙাচোরা বসতিতে মানুষের বাস। ঘর ভাঙাচোরা, মানুষগুলোও কেউই আস্ত নয়। ও নিজেও তো তাই।

ওই কালো পাথরেই শুরু। পাথরের কালো কুচকুচে গায়ে কে যেন এঁকেছে সাদা ধবধবে একটি ছবি। বালা পরা দুটি পুরুষালী বলিষ্ঠ হাতে ধরা একটি বাঁশি। মাথার উচ্চতায় শুধু পালকের আভাস। চুনে তুলি ডুবিয়ে আঁকা বলেই মনে হয় ওর। নাহলে ওই পাথরের গায়ে কোনও রঙই ধরবে না তো। যতবার এখানে আসে ও, পথ শেষ হলেই চোখে পড়ে ওই ছবি। দুহাতে ধরা ওই বাঁশিটি বড় চমৎকার লাগে ! সে যেন ডেকে হেঁকে বলছে, "এসো, যে যেমন হও এসো। আমার সুরধ্বনি শোন। এই ধ্বনিতে শুধু প্রেমের সুর বাজে।"

ফাঁকা পথে কোথায় যেন কোকিল ডাকে। যেতে যেতে শোনে নবীনা। পাখিটার খোঁজে এদিক ওদিক তাকায় একবার। এখন হেমন্তকাল। তাহলে কী অসময়ে ডাকছে ও ? মনে তিরতির করে বয়ে চলেছে মৃদু এক উত্তেজনা। একটু আগের ঘটে যাওয়া ঘটনাটা ওকে এখনও আবিষ্ট করে রেখেছে। তাই শুধু শুধু ঘেমে যাচ্ছে। ওড়নার খুঁট দিয়ে গাল, গলা, কপাল মোছে একবার। কতদিন পরে এল আবার। প্রায় দু'মাস হতে চলল। আজ সবার সঙ্গে দেখা হবে। কথা হবে।

পায়ের কাছের কাপড়টা একটু তুলে এগোয়। সামনেই নদী। নদীতে হাঁটুজল এখন। যাওয়া যাবে। বর্ষাকালে জল বাড়ে। তখন এভাবে হয়না। পারাপারে অন্য ব্যবস্থা নিতে হয়। নবীনা এগোতে এগোতে একবার পেছন ফিরে দেখে। কেউ ওর পেছন পেছন আসছে না তো। না। কে আসবে আবার ? আসলে ঝুমুরকে নিয়ে আসার পর থেকেই এই ভয় পেয়ে বসেছে। সারাক্ষণ ভাবে, ঝুমুরের সন্ধানে ওকে ধাওয়া করে কেউ চলে আসছে না তো ?

স্কুলে চন্দনাকে ও বলেছিল, "এ সপ্তাহে চারদিন ছুটি। পিসিমনিকে বলেছি আমরা তোর মামার বাড়ি মুর্শিদাবাদে যাব।"

চন্দনা ভ্রু কুঁচকে মিটিমিটি হেসেছিল। "আবার ? বারবার আমি এত দায়িত্ব নিতে পারব না। কোথায় যাস তুই ?"

ও ফিরিয়ে দিয়েছিল হাসিটা। "যাবি তো চল। বলতে পারব না কোথায় যাই, কেন যাই। তোকে নিয়ে যেতে পারি। আর পিসিমনির ব্যাপারটা আমি বুঝে নেব।"

"অমনি রাগ হয়ে গেল ! আচ্ছা ঠিক আছে। তোর পিসিমনি আমাকে ফোন করলে সামলে নেব।"

"তুই যাবি ?"

"পাগল !"

ও জানত চন্দনা আসবে না। তাই বলেছিল। এলে ওকে নিয়ে অন্য কোথাও যেতে হত। স্কুলের চাকরিটা ওর পাকা নয়। ইংরাজীর একজন দিদিমনির বদলীতে ও ঢুকেছিল। তারপর আর বেরোনো হয়নি। সারাবছরে একজন দুজন অনুপস্থিত থাকেই। তাদের বদলীতে স্কুল ওকে নিয়ে নেয়। বাবার রেখে যাওয়া ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের সুদের সঙ্গে বাড়িভাড়ার টাকাটা যোগ হয়। সংসার চলেও তাতে অনেকটাই উদ্বৃত্ত থাকে। তাই উপার্জন সামান্য বা বেশি যাই হোক না কেন, নবীনা মাথা ঘামায় না। ওর হাত খরচ চলে গেলেই হল। আসলে কিছু না করলেও ওর, পিসিমনির, বেঁচে থাকার বা চিকিৎসার জন্য অর্থের অভাব কোনদিনই হবেনা।

রেজাল্ট খারাপ ছিল না। পিসিমনি অনেকবার স্কুল সার্ভিসে বসতে বলেছে, ও বসেনি। স্যারেরা বলেছিলেন কলেজ সার্ভিসের জন্য নেটে বসতে। সেটাও বসা হয়নি। আসলে ধরাবাঁধা চাকরির কথা ও ভাবতেই পারেনা। ইংরাজীতে এম এ করার পর সাংবাদিকতার কোর্স করেছিল। কদিন এ কাগজে ও কাগজে ফ্রি ল্যান্সিং করেছে। এখন আর সেটাও ভালো লাগেনা। এই বেশ আছে। ইচ্ছে হলে এদিক সেদিক বেরিয়ে পড়ে। স্কুল কামাই করলেও বড়দি তেমন কিছু বলেন না। কেননা সিলেবাস শেষ করার ব্যাপারে ও খুব সিরিয়াস।

নদী পার হয়েও খানিকটা হাঁটা পথ। তারপর বন। নদী পেরিয়ে গেলেও বনের রাস্তাটা খুব গোলমেলে। ওর মনে হয় যাদের কাছে খবর এসেছে, তারা ছাড়া কেউ ওই পথটা পেরোতে পারে না। এরকম ওর মনে হয়। হয়ত তা নয়। নাহলে এত মানুষ ওখানে এলো কিভাবে। তবে ওর কাছে খবরটা ভারি অদ্ভুতভাবেই এসেছিল।

নবীনার কাছে যেদিন খবর আসে, ও সেদিন একেবারে চুপ করে বসেছিল স্টেশনে। ভাবছিল কোথায় যাবে ? নাকি আদৌ যাবে না। ঠিক সেই সময়েই ওর মনে পড়ে শান্তদার কথা। ওই মানুষটাকে জিজ্ঞেস করলে হয়। সেবার যখন ও একা একা সুন্দরবনে গিয়েছিল, শান্তদার সঙ্গে আলাপ হয়। শান্তদা ওকে বলেছিলেন "এই ঝড়ে বিধস্ত মানুষগুলোর জন্য তুমি একদম একা ছুটে এলে, যদি বিপদ হত ?"

"হত।"

"মানে ? তুমি ভয় পাওনা ?"

"না। আমার হারাবার কিছু নেই।"

"একা মেয়ে, কেউ যদি ... ? ভয় হয়না তোমার ?"

পুরো কথাটা উচ্চারণ করেননি শান্তদা। উনি এমনই। ভীষণ ভদ্র।

ও বলেছিল, "মন আরো দামী। দাগ লাগলে হয় একেবারেই ধোওয়া যাবে না কিংবা ধুতে অনেক সময় লাগবে।"

শান্তদা স্থির দৃষ্টিতে দেখেছিলেন ওকে। ওই দেখাটা শুধু দেখা নয়, একটা ভাবনাও চলছিল ওনার মাথায়। কেননা তারপরেই বলেছিলেন "কাল বাড়ি ফিরবে তো। সামনের সপ্তাহের মধ্যে আমার সঙ্গে একবার দেখা করো। দরকার আছে।"

এই আরশিনগরে শান্তদা ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। ও জানতে চেয়েছিল "এখানকার নাম এমন কেন ?"

শান্তদা বলেছিলেন "এ নাম এক কবির গানে আছে। আর "এখানে যে পড়শি বসত করে।" তাই হয়ত এই নাম মুখে মুখে চালু হয়েছে।"

দু'একদিন ওখানে থাকার পর ও আরশিনগরের হালচাল বুঝেছিল কিছুটা। তখন ও দেখেছিল ওখানে এমন অনেকে আছেন, যাদের অস্তিত্ব সামাজিক ভাবে আর নেই। ও চমকে যায়, যখন দেখে বিখ্যাত লেখক তপনতনু আরশিনগরে নিজের বাগানে মাটি খুঁড়ছেন। গাছের চারা লাগাবেন।

ওনাকে ও চেনে। একবার বইমেলায় ওনার বই কিনে ওনাকে দিয়ে সই করিয়েছিল। তপনতনুর নিরুদ্দেশ হওয়ার খবরটা কাগজে বেরিয়েছিল। উনি নাকি একদিন মর্নিংওয়াকে গিয়ে আর ফেরেননি। বিখ্যাত নায়িকা মণি কুন্তলা, গায়িকা বাসন্তী পাইনের মত বেশ কিছু মানুষ এই আরশিনগরে দিব্যি আছেন।

আরো অনেকে ধীরে ধীরে জড়ো হয়েছেন। এখানে কোন তাড়া নেই। কোথাও পৌঁছনোর দৌড় নেই। যার যেমন ইচ্ছে সে সেভাবে দিন কাটায়। শুধু একটা জিনিসই খেয়াল রাখা হয়। একজনের ইচ্ছে, অন্যজনের ইচ্ছেতে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়।

আরশিনগর গড়ে উঠেছে একটু একটু করে। শুধু বেড়ানোর জন্য বা ঘুরে দেখার জন্য কেউ আরশিনগরে আসতে পারেনা। শান্তদা বলেন যাদের কোন বিপন্নতা নেই তারা এখানে আসতে যাবে কেন ? আর শুধু শুধু দেখতে আসা ? এটা কোন চিড়িয়াখানা নয়। যেদিন মন চায় পেছনের সবকিছু এক ঝটকায় ঝেড়ে ফেলে এখানে আসে অনেকে। যেমন খুশি যতদিন খুশি থাকে। তারপর আস্তে আস্তে এখানকার বাসিন্দা হয়ে ওঠে। চলে যেতে কোন মানা থাকেনা। আবার ফিরে আসতেও কোন বাধা থাকেনা।

ওর সঙ্গে শান্তদার কথা হলে ও বলেছিল, "তাহলে আমাকে ওখানে চোখ কান খোলা রেখে চলতে, আর তেমন কিছু বুঝলে আপনাকে জানাতে বলেছেন কেন ? ও তো খেয়ালখুশির জায়গা।"

"তুমি জানো নিশ্চয়ই ইতিহাসের সেই গল্পটা। সম্রাট নিরো বেহালা বাজানোয় উদ্দীপনা পাবেন বলে গ্রীসের পম্পেই নগরীতে আগুন লাগিয়েছিলেন। আমাদের অনেকের মধ্যে এরকম উদ্ভট স্বার্থপর খেয়ালি মানুষ ঘুমিয়ে আছে। আমি চাইনা একজনের খেয়াল অন্যজনের ঘর পুড়িয়ে দিক।"

মানুষটাকে চিনতে একটু সময় লেগেছিল ওর। তখন প্রথম প্রথম, ওকে দূরত্ব রেখে কথা বলতেন উনি। এতটা ঘনিষ্ঠতা হয়নি। তখনই বলেছিলেন, "জান, এই "আমি" শব্দটাই সব অনর্থের মূল। "আমরা" বলবে "আমরা"।"ওকে আরশিনগরে নিয়ে এসে বলেছিলেন, "আমার মনে হয় এখনও তোমার সময় হয়নি। তুমি এখানকার স্থায়ী সদস্য হয়ো না। ইচ্ছে হলে দু'একদিন ঘুরে যেও। আরো বড় কাজ দেব তোমায়। মানুষের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করার লোকের খুব অভাব। আমরা সবাই বড় স্বার্থপর। এই আরশিনগরে যদি একটুকরো স্বার্থশূন্য পৃথিবী গড়ে ওঠে, ভালো লাগবে না তোমার ? তবে এই স্বপ্ন আমি একা দেখলে হবেনা তো"।

একটু থেমে আবার বলেছিলেন, "তুমি যদি একটু খেয়াল করে দেখো, আরশিনগরে তেমন কিছু গোলমাল হলে তুমি ঠিক দেখতে পাবে।তোমার চোখে তেমন কিছু গোলমাল ধরা পড়লে আমাকে জানাবে।আর বাইরের জগতের কোন

মানুষ বিপন্ন হলে, সংসারে থাকতে না চাইলে তাকে এখানে আনতে পারো। তবে তেমন কাছের বা পরিচিত কেউ না হলে, সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমাকে বোলো। আমরা আগে বিশদে জেনে নেব। তারপর তাকে এনো।"

ও অস্থির হয়ে বলেছিল "যদি জানাতে গিয়ে বিপদ হয়ে যায় ?"

"এক দু'দিন তাকে কোনরকমে সামলে রাখতে পারবে না ? নাহলে চিনুর বাড়িতে রেখো। ওটা আমাদের "সেফটি জোন।" হয়ত রাগ করবে। কিন্তু আমি জানি ও ফিরিয়ে দেবে না।" চিনু শান্তদার ছোট বোন। এসবের মধ্যে সরাসরি না থাকলেও আছে। নীরবে কিছু কিছু কাজ করে। তবে সেসব কাজের গুরুত্ব কম নয়।

অত কথা হয়ে যাবার পরেও, শান্তদাকে কিছু না বলেই, সেবার কাজল আর সেলিনাকে আরশিনগরে পৌঁছে দিয়েছিল ও। ওদের ঘর খুঁজে দিয়েছিল। জানাতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যেত। সেলিনার দাদারা খ্যাপা কুকুরের মত খুঁজছিল কাজলকে, পেলে হয়ত মেরেই দিত। হয়ত সেলিনাকেও মারত ওরা, কে জানে ? ওরা ওদের এক বন্ধুর ফ্ল্যাটে লুকিয়ে ছিল। সেলিনার দাদাদের জন্য সেই বন্ধুও ওদের বেশিদিন রাখতে সাহস পাচ্ছিল না।

নাজিমার বোন সেলিনা। ধনী ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে। ভীষণ গোঁড়া ওদের পরিবার। সাধারণ হিন্দু পরিবারের ছেলে কাজলের সঙ্গে সম্পর্ক, ওর বাবা, কাকারা মানবে কেন ? বিয়ের দেখাশোনা শুরু হয়েছিল। দিন ঠিক হতেই পালিয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। ওর কাছে বোনের হয়ে সাহায্য চাইতে এসেছিল নাজিমা। কলেজে করবী, নাজিমা, নবীনা, সবাই একসঙ্গে পড়েছে। ওর কীর্তিকলাপ কিছু কিছু নাজিমাও জানত।

নাজিমা বলেছিল, "নবীনা, বাঁচা ওদের। বাড়ির কথায় বিয়ে করতে হলে সেলিনা বাঁচবে না। আমার বোনকে আমি চিনি। অসম্ভব জেদি, নিজের মতে চলে। আমাকে বলেছে "আমি সুইসাইড করব, তবু অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারব না।" আমার মনে পড়ল তোর কথা। করবীর মামার নানারকম কাজের সঙ্গে তোর যোগাযোগ আছে। সেসব গল্প শুনেছি তো। পারলে তুই ওদের বাঁচাতে পারবি। কাজলের সঙ্গে ওর আলাপ রিসার্চ করতে গিয়ে। প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে। এমন তো হতেই পারে। কিন্তু কাজলের বাড়ি মানলেও আমাদের বাড়ি মানবে না।

"তুই কথা বলেছিলি কাজলের সঙ্গে ?"

"হ্যাঁ। ও বলেছিল কদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবে, তারপর দেখা যাবে। কিন্তু আমি যা বুঝছি, বাড়িতে টের পেয়েছিল। তাই আমাকে ডিঙিয়ে বোনের জন্যই ওরা আগে সম্বন্ধ দেখতে শুরু করেছিল। এখন কোনও আপত্তি না শুনেই জোর করে বিয়ে দিয়ে দেবে। নবীনা, বড় আশা নিয়ে এসেছি। কিছু একটা কর। ওদের বাঁচা।"

তখনই কথাটা মাথায় আসে ওর। ছেলেমেয়ে দুটোকে বাঁচানোর পথ একটাই। আরশিনগর। ওদের আসার পরদিন আসেন শান্তদা। শোনেন দুজনের কথা। বিয়ে না করে একসঙ্গে অনেকেই থাকে এখানে। সেলিনা থাকবে না। অগত্যা বিয়ে। হেনাদি আর শান্তদা দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিলেন ওদের। বিয়ের ঘটনা এর আগে ঘটেনি আরশিনগরে। যেমন কোন শিশু এখনও অবধি জন্মায়নি এখানে।যদিও কথাটা মানেন না হেনাদি। বলেছেন, "আমার বাড়িতে এসে দেখে যেও কতগুলো গুঁড়ি গুঁড়ি বেড়াল হয়েছে। ওদের জন্ম কী জন্ম নয় ? ওরাও তো শিশু, 'বেড়ালশিশু'।"

এহেন আরশিনগরের প্রথম বিয়ে, কাজল আর সেলিনার।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় লাইব্রেরির সামনের বাগানে হল বিয়ে। ছোট্ট অনুষ্ঠান। দুগাছি জুঁই ফুলের মালার মালাবদল। আগুন নয়, আকাশের চাঁদকে সাক্ষী রেখে, হিতাকাঙ্খীদের সামনে হাতে হাত ধরে সাত পাকে গোল হয়ে ঘুরল ওরা। বিয়ের শপথ মন্ত্র পড়ালেন হেনাদি। ওটি তারই রচিত। সেলিনা সিঁদূর পরতে চায়নি, পরেনি। ওদের নতুন কাপড় দিয়েছিলেন শান্তদা। আর হেনাদি, চিত্রাদি বিয়ের আসরে উপস্থিত সবাইকে খিচুড়ি আর আলুরদম খাইয়েছিলেন পেট

ভরে। এখানকার অন্য বাড়িগুলোর মতই একটা পুরনো বাড়ি পরিষ্কার করে ওদের থাকার জন্য দেওয়া হয়েছিল। সেই বাড়ির ভাঙা ঘর সেদিন ফুলে ফুলে ভর্তি হয়ে যায়। সবাই নিজের নিজের বাগানের ফুল এনেছিল।"

শান্তদা বলেছিলেন, "আরশিনগরের কেউ বিয়ে করতে চাইলে এভাবেই হবে। এখানে কোন মানুষের জন্ম না হলেও মৃত্যু তো আটকানো যায়নি। বিয়েই বা হবে না কেন?"

এবারে গিয়ে শুনল ও শান্তদা অনলাইনে যোগাযোগ করে কানাডায় কী একটা স্কলারশিপের ব্যবস্থা করেছেন কাজলের জন্য। ওরা দুজনেই চলে যাবে। আসলে কাজল, সেলিনা খুবই মেধাবী। পড়াশুনা ছাড়া জীবন ওরা ভাবতেই পারেনা। দুজনেই চাইছে রিসার্চ শেষ করতে।

হাসতে হাসতে শান্তদা বলছিলেন সেদিন, "এবার ওদের সামাজিক বিয়ে মানে রেজেস্ট্রি করতে হবে, নাহলে পাসপোর্ট পাবেনা।"

নবীনা জানে ওই রেজেস্ট্রির বন্দোবস্তও উনিই করবেন। কিন্তু কারোর কাছে কখনও উল্লেখটুকু করবেন না।

সেদিন ও স্টেশনে বসে বসে কে জানে কেন শান্তদার কথাই ভাবছিল। ঠিক তখনই কাকতালীয় ভাবে ওই মানুষটা আসেন। বলেন, "তোমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাব। চেনাবো। জায়গাটা ভালো লাগবে তোমার। তবে এখনও সময় হয়নি। আরো কিছুদিন যাক। তুমি এখানে একা একা বসে আছো কেন? কেউ আসবে?"

ও বলেছিল, "না। কিছু ভালো লাগছে না। কোথাও যাব ভাবছি। এনজিওর কোন প্রজেক্ট শুরু হবে কি? আমি জয়েন করব তাহলে।"

শান্তদা এগিয়ে আসা ট্রেনের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "আজ আসছি। তুমি এক কাজ করো। কালই এসো। আমি কোথায় থাকি জানা আছে?"

"জানি।"

"এসো, বিকেলের দিকে আমি থাকব।"

শান্তদা শুধু যে মাঝেমাঝে আরশিনগরে যান, তাই নয়। উনি ওখানকার মানুষদের একজন সুহৃদ। বিপদে আপদে ওদের পাশে থাকেন। ওদের বন্ধু করবীর মামা। একজন অসাধারণ মানুষ। বড় একটা চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজের পয়সায় একটা এনজিও শুরু করেছিলেন। শুরুর টাকাটা উনি নিজে দিলেও এখন ওনার বড় চাকুরিজীবি বন্ধুরা, অনেক সহৃদয় মানুষ, ওটাতে টাকা ঢালছেন। বিদেশী ফান্ডও কিছু পাওয়া গিয়েছে। এনজিওটা নেহাত ছোট নয়। শান্তদা এনজিওর জন্য মাইনে দিয়ে দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে রেখেছেন। বড় কোনও প্রজেক্ট শুরু হলে ওদের মানে করবীর বন্ধুদের ডাকেন। কাজের জন্য টিফিন আর যাতায়াতের খরচ দেন। বলেই দিয়েছেন মানুষের সেবার জন্য এই প্রতিষ্ঠান। আমি অতিরিক্ত টাকা জমাই। সেটা এনজিওর ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে ঢালি। অসুবিধার সময় কাজে লাগবে। ওনার হিসেবের খাতা অফিসে সামনে খোলা থাকে। প্রতিমাসের হিসেবে সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবেই নজর দিতে হয়। এনজিও দুস্থ্য বাচ্চাদের চিকিৎসা করায়, অক্ষর পরিচয়ের ব্যবস্থা করে, দুধের কৌটো দেয়। আর নিম্নবিত্ত ঘরের মায়েদের জন্য ন্যাপকিন, অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব রোধের বড়ি যোগায়। এক একটা অঞ্চল ধরে কাজ হয়। মা, বাচ্চাদের মোটামুটি একই সঙ্গে পাওয়া যায়। এছাড়াও যেকোনও দুর্বিপাকে গরীব মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় ওনার এনজিও।

চাকরি করাকালীন একটা স্টেশন ওয়াগানার কিনেছিলেন। ওই গাড়ি চেপে প্রত্যন্ত গ্রামে, বন্যা বা ঝড় বিধস্ত এলাকায় পৌঁছে যান শান্তদা। সবসময় সঙ্গে রাখেন নিজের মায়ের একটি ফটো। শান্তদার কাছে সবটাই শুনেছিল ও। চাকরি ছেড়ে

এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় ওনার বিধবা মা নিজের গহনা ওনার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, এসব তোর ভাগের। বিয়ে করলে তোর বউ পেত। এ গহনা নিয়ে কোন সঙ্কোচ করিস না বাবা। ইচ্ছেমত ব্যবহার করিস। হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "জানো, মিনুর কাছে রাখতে দিয়েছিলাম,ও মায়ের হাতের বালা, গলার একটা হার আর দু' জোড়া দুল কিছুতেই দিল না। বলল 'বিয়ে নিজের হাতে থাকেনা। বিয়ে না করলে তখন মায়ের বালা, হার ফেরৎ নিস। আর ভাগ্নে ভাগ্নির জন্য মামার উপহার হিসেবে দুটো দুল রইল। বাউন্ডুলে মামার যা ছিরি, ভাগ্নের বউকে আর ভাগ্নিকে বিয়েতে কিছুই দিবি না হয়ত। এগুলো রেখে দিলাম। তখন হাতে করে দিবি তুই।' ওর সঙ্গে লড়াই করে আমি পারিনা। তাই ওগুলো ছেড়েই দিয়েছি।"

মিনু, করবীর মার নাম। উনি শান্তদার ওপরের বোন। একদম সাধারণ মানসিকতার মানুষ। মেয়ে বিয়ে না করে ভাই এর সঙ্গে মেতেছে বলে যথেষ্ট আফসোস আছে তার। শান্তদার আর একটি বোন চিনু। সেই বোনের ছেলে রণও সদ্য ডাক্তারি পাস করেছে। খুব ভালো ছাত্র। তবে ছোট থেকে মামাকে দেখার ফলে ও ওর মামার মতই একটু অন্যরকম। অনেকসময় তার ডাক্তার বন্ধুরাও আসে। বিপদ আপদ ঘটলে একসঙ্গে কাজ হয়। তবে আরশিনগরে শান্তদা ওদের কখনও নিয়ে যাননি।

লম্বা, তীক্ষ্ণ মুখচোখ, পেটা স্বাস্থ্যের শান্তদাকে ভিড়েও খুঁজে পাওয়া যায়। যেখানে যখনই থাকুন ঠিক সকাল সাড়ে ছটায় আধঘন্টা দৌড়ন। প্রিয় মিষ্টি গরম জিলিপি। সিগারেট বা মদ কখনও ছুঁয়ে দেখেন না। শান্তদার দৃষ্টি বড় প্রখর। নবীনার মনে হয়, ওনার সামনে কেউ একটাও মিথ্যে কথা বলতে পারবেনা।

নিজের বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন। এখন মেসে একটা ঘর নিয়ে একা থাকেন। ভালো খেলে খুশি হন। তবে সাধারণ খাওয়া দাওয়াই জোটে। সবাইকে খাওয়ানোর ব্যাপারে শান্তদার উৎসাহ বোঝা যায় এনজিওর ফিস্ট থাকলে। প্রচুর খাবার আনিয়ে হই-চই করতে থাকেন। ওনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে বই। নানান বই কেনেন, আবার পড়া হয়ে গেলে আরশিনগরের লাইব্রেরিতে দিয়ে দেন। এম আইটির স্নাতক। অনেকদিন বিদেশে বড় কনসার্নে চাকরি করেছেন। তারপর সব ছেড়েছুড়ে চলে আসেন। পেছনের কাহিনি কেউ জানেনা। করবী ওর মামার কথা খুব গর্ব করে বলত কলেজে। আলাপ হল করবীকে ছাড়াই সুন্দরবনের ত্রাণে কাজ করতে গিয়ে।

ওর সব কথা, কিছুই না লুকিয়ে ও বলেছিল শান্তদাকে। সুন্দরবন থেকে ফেরার পথে নদীর বুকে লঞ্চে বসে ওর কেমন যেন ইচ্ছে হয়েছিল সব কথা বলার। কে জানে নদী, খোলা আকাশ, আকাশে ভেসে থাকা অনেক দূরের তারারা হয়ত সাহস দিয়েছিল ওকে। নাহলে নিজেকে খোঁড়ার দুঃসাহস ওর কমই হয়। তার পরের চাপটা ও নিতে পারেনা। প্রায় দশ বারো বছরের বড় আপাতগম্ভীর, স্বল্পভাষী, বাউন্ডুলে মানুষটার মধ্যে কি যেন আছে। সেটা বোধহয় এক ধরণের আশ্রয়। যা সহজেই সবকথা বলিয়ে নেয়।

সেদিন শান্তদা চলে যাবার অনেক পরে বাড়ি ফিরেছিল ও। স্টেশনে অনেক রাত অবধি বসে বসে ট্রেন দেখছিল। আপের ট্রেন, ডাউনের ট্রেন। পিসিমনি ম্লান হেসে বলেছিল, "একটু বলে যেতে কী হয় ? চিন্তা হয়না বুঝি ?"

পিসিমনিও জানে ওকে। আটকায় না। তবে সব কথা সবসময় বলেনা নবীনা। ভয় পাবে। ওকে আঁকড়েই তো ওই মানুষটারও বেঁচে থাকা।

# # #

"আরশিনগর" নামটা হেনাদির দেওয়া। হেনাদি, চিত্রাদি আরশিনগরে প্রথম আসা কয়েকজনের মধ্যেই পড়েন। ওদের মতামতকে সবাই সমীহ করে। ঝুমুরকে আরশিনগরে নিয়ে আসার আগে শান্তদার সঙ্গে কথা বলেছিল নবীনা। ওকে বাঁচাবার আর কিছু উপায় না দেখে ওকে সঙ্গে করে আরশিনগরেই নিয়ে আসে। ঝুমুর এখন বেশ ভালো আছে।মনুয়া বলে

ওর সমবয়সী একটি মেয়ের সঙ্গেই ওকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। এবারেও ঝুমুরের জন্য সাদা বাদাম বেশ কিছুটা সঙ্গের ঝোলাতে নিয়েছে নবীনা। ঝুমুর বাদাম খেতে বড় ভালোবাসে। একটা লাল চিরুনী, গোল হাত আয়নাও কিনেছিল। দেবে ওকে। ভাঙা চিরুনীতে চুল আঁচড়ায় মেয়েটা। কালো কোঁকড়ানো চুলের ঢাল ওতে সামলানো যায়না।

ঝুমুরের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল এই বিনোদিনী স্কুলে। সেসময় বিটি পড়তে যাওয়া কোন এক দিদিমনির বদলিতে এখানেই কাজ করছিল ও। ঝুমুর দাস। ক্লাস ইলেভেন। ইংরাজী ক্লাসে ফার্স্ট বেঞ্চিতে বসা ঝুমুরের ফর্সা হাতে, গলায়, ফুটে ওঠা স্পষ্ট আঁচড়ের দাগ, পড়াতে পড়াতেই চোখে পড়েছিল ওর। টিফিনের পরের পিরিয়ড ছিল সেটা। ও জানতে চেয়েছিল, "আজ কবাডি খেলেছ বুঝি ?"

সঙ্গে সঙ্গে হাতের দাগদুটো আড়াল করে ঝুমুর বলেছিল, "না তো।"

ছুটির পর মেয়েটাকে ধরেছিল ও। ঝুমুর বলেছিল "দেরী হয়ে যাবে দিদি। পরে কথা বলব।"

ও বলেছিল, "হোক। আমাকে সবটা বলো। নাহলে তোমার বাড়ি যাব।"

কিছু কিছু জীবন নখে দাঁতে আঁচড়ায়। শামুখের খোলায় পা কাটে অকারণে। ঝুমুরের ভাগ্য সেরকম। তাই বারো ক্লাসের পরীক্ষার রেজাল্ট হাতে নেবার পরপরই, কাউকে কিছু না জানিয়ে, ঝুমুরের হাত ধরে এই আরশিনগরে নিয়ে আসতে বাধ্য হয় ও। ঝুমুরের মা জানে ও কোনও অনাথআশ্রমে আছে।

এখান থেকেই হেনাদির কাছে পড়ে প্রাইভেটে কলেজের পরীক্ষাগুলো দেবে মেয়েটা। এই পুরো ব্যবস্থাটার পেছনে নীরবে আছেন একজন মানুষ। তিনি শান্তদা। আরশিনগরের পুরনো অভিভাবক। হেনাদি, চিত্রাদির মত কিছু মানুষও ছুঁচের গর্তে সুতো গলানোর সাধনায় নিরলস লেগে আছেন। তারা এই এলোমেলো মানুষদেরও একটা তাল লয় মাপার ব্যবস্থা রেখেছেন। নাহলে বড় বেসুরো হয়ে যেত সবকিছু।

ছোটবেলা থেকে প্রচুর বই পড়েছে নবীনা। স্মৃতিতে আছে কোনও বিখ্যাত লেখকের আসা যাওয়ার পথের ধারে লুকিয়ে থাকা এমন এক ঠিকানাবিহীন জনপদের কথা। যেখানে সেই বাউন্ডুলে নিজের খেয়ালে চলা নায়ক মাঝেমাঝেই পৌঁছে যায় আর সমদর্শী মানুষদের সাথে কিছু দিন কাটিয়ে আসে। নিজের জীবনে সেটা সত্যি হবে এমনটা কখনও ভাবেনি। শেষপর্যন্ত সেটাও ঘটল।

আবোলতাবোল ভাবাটা শেষ হল ওর। আরশিনগরের পথে ঢুকতে ঢুকতে পড়ন্ত আলোয় চোখে পড়ল কবাডি খেলা হচ্ছে। মেয়েরা একদিকে, ছেলেরা অন্যদিকে। বয়সের কোন বাছাবাছি নেই। ওকে হঠাৎই দেখতে পেয়েছে ঝুমুর। কোর্টের একদম ধারে দাঁড়িয়ে ওকেই দেখছে একমনে। খেয়াল নেই আউট হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে ওর পাশে এসে দাঁড়াল মনুয়া। তারপর একে একে বিশ পঁচিশ সবাই। খেলা আপাততঃ বন্ধ। বাঁশি মুখে নিয়ে ওকেই দেখছেন চিত্রাদি। উনিই রেফারি তাহলে। একসময় বাংলার টিমে কবাডি খেলতেন। চাকরি পাওয়াটাও কবাডির সূত্রে। তারপর তো সব ছেড়ে এখানে আবার শুরু করেন। মাঠে গিয়ে ও বসল একপাশে। খেলা আবার শুরু হয়েছে।

এসব সময়ে কেমন একলা হয়ে যায় ও। মা বাবার কথা মনে হয়। ছোটবেলায় পিসিমনি একটা ক্যালেন্ডার দেখিয়ে বলেছিল একদিন, "মা আর বাবার কথা মনে হলে এই ক্যালেন্ডারটার পাতা ওল্টাবি। তারপর যে কোন দুজনের ছবিকে মা বাবা করে নিবি।"ও বাছতে পারেনি একদম। রামসীতা, লক্ষী নারায়ণ, শিবদুর্গা, কে নেই সেই ক্যালেন্ডারের ছবিতে। তবে ওদের কাউকেই পছন্দ হয়নি ওর। সামনে গেলেই নির্ঘাৎ আড়ষ্ট হয়ে যেত। অত গয়না পরা যে !

তাছাড়া ওর স্মৃতিতে মা বাবা খুব স্পষ্ট। তারা প্রচুর লড়ালড়ি করেন। অত সহজে তাদের মুছবে কিভাবে ?

খেলা শেষ হতেই ওর দিকে দৌড়ে আসছিল ঝুমুর। মনুয়া ওর হাত ধরল। "দাঁড়াও, আমরা স্নান সেরে তোমার সঙ্গে দেখা করব। সারা গায়ে ধুলো লেগে আছে।"

ঝুমুর পেছন ফিরে ফিরে দেখছিল ওকে। ক্রমশঃ আকাশের আলো কমছে। মাঠ পেরিয়ে চিত্রাদির সঙ্গে প্রণব বাবুর ঘরের দিকে যেতে যেতে ও আস্তে করে বলল "চিত্রাদি, তোমার কারিপাতা গাছ আর কারিপাতা এনেছি।"

"এনেছ, তাহলে রাতে এসো। আজ সম্বর করব। ঘরে লাউ, কুমড়ো, ডাঁটা, বেগুন সব আছে। তেঁতুলও। মনুয়া আর ঝুমুরকেও এনো। প্রণব তুমিও এসো।"

এগোতে এগোতে লাইব্রেরি বাড়ির কাছে পৌঁছেছে সবাই। এই বাড়িটা বেশ বড়। আগে বোধহয় এখানে ছোটদের ইস্কুল ছিল। সবাই মিলে সেই বাড়িতেই একটা লাইব্রেরি গড়ে তোলা হয়েছে। দেওয়ালের ভাঙাচোরা অংশে বোর্ডের ওপর সাদা কাগজ লাগানো। তাতে অনেকে ছবি আঁকেন, অনেকে ইচ্ছেমত কিছু লেখেন। নবীনা লিখল, "আজ এলাম। সবাইকে ভালবাসা জানাই।"

ভেতরে ঢুকতেই নজরে এলো সুকুমার একটা বই খুলে কিছু লিখছে ডায়েরিতে। ও খুব পড়ুয়া। ইতিহাসের ছাত্র। মাঝে মাঝে এখানে সেমিনার হয়। তখন খোলা মাঠে সুকুমারের আলোচনা শুনেছে ও। নবীনাকে সুকুমার দেখতেই পেল না। নবীনা ব্যাগ খুলে চারটে বই রাখল টেবিলের ওপর। তারপর একটা বড় লাল খাতা খুলে ডেট লিখে বইগুলোর নাম, লেখকের নাম, আর কি বিষয়ের বই সেটা লিখে দিল। এবার কেউ সাজিয়ে বইটা ঠিক তাকে রেখে দেবে। দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, বিজ্ঞান না শুধুই সাহিত্য, সেটা লিখলে প্রয়োজনের সময় বই খুঁজতে সুবিধা হয়। কিছু পর্নোগ্রাফির বইও আছে। কে জানে কে জমা দিয়েছে ? ওই বইগুলোর ব্যাপারে রীতিমত মিটিং করে সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

কেউ কেউ বলেছিল, "এই বইগুলো রেখে কী হবে ? এগুলো নষ্ট করে দেওয়া হোক।"

শান্তদা বলেছিলেন, "যে বিষয়েই হোক, ওগুলো কিন্তু বই। বই নষ্ট করা যায় না কোনওভাবেই। আমি অন্ততঃ যেকোনও বইকে এই সম্মানটুকু দিই। তোমরা পড়ো না। আবার ইচ্ছে হলে পড়ো। সাবালক মানুষদের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম খাটে না। এ তো বোমা, বন্দুক নয় যে নিষিদ্ধ করা হবে।"

সেদিন ওরা থাকতে থাকতেই, সন্ধ্যা নামল। লাইব্রেরিতে সান্ধ্য সঙ্গীত শুরু হল। গাওয়া হল, "জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে।" বাইরের খোলা বারান্দায় এসে নবীনাও গলা দিল গানে। সুকুমার এলনা। ও তখনও মোমবাতির আলোয় নোটস লিখছে।

লাইব্রেরিতে সর্বনাম আর ব্যাঞ্জনবর্ণ অনুযায়ী অনেকগুলো খাতা আছে। লেখকের নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী প্রত্যেকটি খাতায় বইএর নাম লিখে রাখতে হয়। "র", "স" আদ্যক্ষরওলা খাতার সংখ্যা অনেকগুলো। বিদেশী বই কম। তাই চারটে করে অক্ষর নিয়ে একটা খাতা করা হয়েছে।

এসব ব্যবস্থা হেনাদির। এখানে আসার আগে হেনাদি একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াতেন। ভাল ছাত্রী ছিলেন। বেশ কয়েকটি ভাষাতে পড়া ও লেখায় স্বচ্ছন্দ। এই লাইব্রেরী ওনার ভাবনার ফসল। উনি এখানে আসার পর বলেছিলেন, "বই ছাড়া মানুষ বাঁচে নাকি ? একটা লাইব্রেরি চাই। গ্রন্থাগারই তো কারাগারের বিকল্প।"

সারা দিন খোলা এই লাইব্রেরির দরজা রাত নটায় বন্ধ হয়। কোন লাইব্রেরিয়ান নেই। শেষে যিনি বেরোন তিনি হাঁসকল লাগিয়ে দিয়ে চলে যান। পরের দিন যিনি প্রথম লাইব্রেরিতে আসবেন তিনিই দরজা খুলে ঢুকবেন, জানলা খুলবেন, প্রথম বই নিয়ে পড়বেন। দিনের শুরুতেই লাইব্রেরিতে ঢোকার জন্য ও কতদিন অনেক রাতে শুয়েও ভোরে উঠে ছুটে চলে এসেছে লাইব্রেরিতে। দরজা খুলে মনে করেছে, আজ "আমিই ফার্স্ট, ফার্স্ট, ফার্স্ট !"

অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী লাইব্রেরি থেকে বই ঘরে নিয়ে যাওয়া যায়না। শুধু এখানে বসে পড়া যায়। অবশ্যই বই দান করা যায়। শান্তদা নিত্য নতুন বই দিয়ে যান এখানে। হেনাদি নিজে পেছনের জীবন থেকে সব গুটিয়ে চলে আসার সময় বেশ কিছু বই সঙ্গে আনেন। সেগুলো সব জমা পড়ে লাইব্রেরিতে। শহরে গেলে অলিখিত নিয়মে প্রায় সবাই একটি দুটি বই হাতে করে নিয়ে আসতে আসতে সংগ্রহশালা বেড়ে এই বিশাল আকৃতি নিয়েছে।

এখানকার বাড়িগুলোর একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। এই অঞ্চলে কোনও এক সময় একটা বড় কারখানা ছিল। সেই কারখানাকে ঘিরেই একটা বসতি গড়ে ওঠে। বাড়িগুলো ছিল কোম্পানীর কোয়ার্টার। কারখানা বন্ধ হতে হয়ত মানুষজন এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যায়। নাকি অন্য কিছু প্রাকৃতিক কারণে এ অঞ্চল জনশূন্য হয়ে গিয়েছে, নবীনা জানে না। ও এসে থেকে দেখেছে ভাঙাচোরা কিছু বাড়ি। ইলেকট্রিকের আলো নেই। জলের জন্য পুরনো সময়ের কিছু হাতল ওলা নলকূপ, বড় কিছু ইঁদারা, আর সরু ওই নদীটাই ভরসা। গরমকালে বালি খুঁড়েও কখনও কখনও জল নিতে হয়। শান্তদা নিজে কিছু নলকূপে সারাইয়ের কাজ করে সেগুলোকে ব্যবহারের যোগ্য করেছেন। একটু দূরে গেলে একটা টিলার ওপরেই আছে ভাঙা এক মন্দির, আর প্রকান্ড এক ইঁদারা। সারাবছর ওই ইঁদারায় জল থাকে। মনে হয়েছে ওই মন্দিরের জন্যই ইঁদারা খোঁড়া হয়েছিল। এখন দেবতা নেই, মন্দির নেই, ইঁদারা রয়ে গিয়েছে। ওখান থেকে প্রয়োজনে অনেকেই জল টেনে আনে। ভেতরে কারো কারো বাড়ির পেছনে ইঁদারা আছে।

বর্ষায় জলের অভাব নেই। নদীও ফুলে ফেঁপে ওঠে। আর নদীতে তখন অনেকে মিলে স্নান করতে যাওয়া হয়। নাগরিক জীবনের কিছু সুবিধা না পেলেও এখানে আস্তে আস্তে এসে জড়ো হয়েছে বেশ কিছু মানুষ।

না কারোর কোন মালিকানা নেই। যারা পাশাপাশি আছে তারাও সঙ্গ ছাড়ে। যেকোন মুহূর্তে নেই হয়ে অন্য কারো কাছে যেতে পারে, আবার কখনো বা একা হয়েই দিন কাটাতে পারে। এরকম পরিবর্তন এখানে বিনা প্রশ্নেই ঘটে।

শালু আর বলাকা স্বামী স্ত্রী। শালুকে বলা হয় কলাকার। ও ছবি আঁকেনা যদিও। অসম্ভব ভালো কাঠের কাজ জানে। গাছের ডাল থেকে বিচিত্র সব বুকসেলফ বানিয়েছে। লাইব্রেরির সব বই তাতেই থাকে। কোন এক সকালে কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে এখানে এসেছিল শালু। সঙ্গে ছিল বলাকা। সেই ঝোলা ভর্তি ছিল নানা যন্ত্রপাতিতে। ওর কাঠের কাজের আঠা কেউ শহরে গেলে এনে দেয়। এবারে নবীনা এনেছে। শালু কখনও হাসেনা। একদিন নবীনা দেখেছিল শালু গাছে মাথা খুঁড়ছে। অনেক কষ্টে সেদিন ওকে থামিয়েছিল ও। কাজের সময় ছেলেটা শান্ত থাকে। তাই চিত্রাদি ওকে সারাক্ষণ কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখেন। কোন কাজ না থাকলে ওকে বন থেকে রান্নার গাছ কেটে আনতে বলা হয়। কারোর বাড়িতে খাট বা চেয়ার, টেবিল বানানোর কাজ দেওয়া হয়।

হেনাদি নিজে প্রতিদিন লাইব্রেরিতে আসেন। কিছু সময় কাটান। বই পড়েন। বই মেরামতি করেন। বই গোছান। আলোর জন্য সকলেই সকালে বই পড়তে আসে। সন্ধের পর দুএকজন মোমবাতির আলোয় কাজ করে। সুকুমার তাদের একজন।

লাইব্রেরিতে ঠিক সন্ধ্যা নামলে যে কজন উপস্থিত থাকেন একটি গান ধরেন। প্রায় রোজই একটি গান গাওয়া হয়। সেটি হল, "জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে ...।"

রুবীদি বলে একজন আছেন গাছপালার ব্যবস্থায়। ওনাকে চিত্রাদি সাহায্য করেন। স্থায়ী বাসিন্দাদের কিছু না কিছু গাছ দেকভাল করতে হয়। নিজের বাড়ির, বা অন্যের বাড়ির, কিংবা পথে বেড়ে ওঠা গাছের যত্নও কেউ কেউ করেন। নবীনা এবারে অনেকগুলো কারিপাতার চারা এনেছে। চিত্রাদিকে দিয়ে যেগুলো বাঁচবে সেগুলো ও মাঠের ধারের জমিতে লাগিয়ে দেবে ভেবেছে।

# # #

নবীনা এবারে তিনদিন থাকবে। ঝুমুরদের ওখানে মালপত্রের ব্যাগ রেখে ও হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিল বিদেশের কাছে। এই ছেলেটার জন্য ওর আলাদা মায়া আছে। সুন্দরী বুদ্ধিমতী স্ত্রী, পাঁচ বছরের ছেলেকে ছেড়ে ও চলে এসেছে। বিশাল অঙ্কের মাইনের চাকরি, বাবার সম্পত্তির মালিকানা, সব ত্যাগ করে, ও এখানে কেন এল ? এ প্রশ্ন বিদেশকে করা যায়না। স্বল্পভাষী ছেলে। তাছাড়াও ওর ব্যক্তিত্বে এমন কিছু আছে, যে ওকে যেকোন প্রশ্ন করা অসম্ভব।

বিদেশের বাড়িটার সামনে একটা যুঁই ফুলের গাছ আছে। তারই গন্ধে চারপাশ ম' ম' করছে। একটা হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জী পরে বিদেশ চোখ বুজে চুপ করে শুয়েছিল ওর বিছানায়। শরীর খারাপ নয়তো ?

কপালে হাত দিয়েই চমকে গেল নবীনা। এত বেশি গরম কেন ?

"বিদেশ, বিদেশ", গায়ে নাড়া দিয়ে ডেকেও সাড়া পাওয়া গেল না। ও অজ্ঞান হয়ে গেল নাকি ? ঘর থেকে বেরিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডাকতে গেল নবীনা। যেতে যেতে ভাবছিল ভারি অদ্ভুত একটা কথা। কে ওকে এখানে পাঠাল ? সে কি ওই বালা পরা হাত ? তার বাঁশির ডাকেই ও এলো এখানে ? ছেলেটা তো নাহলে বিনা চিকিৎসায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকত। হয়ত কেউ জানতেও পারত না।

ডাক্তারবাবু এই আরশিনগরের স্থায়ী বাসিন্দা। ওনার গল্পটা ভারি অদ্ভুত। উনি বেশ নামকরা ডাক্তার ছিলেন। নামের পাশে অনেক বড় বড় ডিগ্রী। অনেক টাকা ফী। জমজমে প্র্যাকটিস। ওনার স্ত্রী বাংলার ডক্টরেট। কলেজে পড়াতেন তখন। অনেকতলা উঁচুতে একটা ফ্ল্যাটে ওনারা থাকতেন। ওঁদের একমাত্র মেয়ে নৃত্যশিল্পী। দেশে বিদেশে প্রোগ্রাম করে বেড়ায়। কাগজে ছবি বেরোয়। নাচের প্রতিষ্ঠান খুলেছে। সব মিলিয়ে সোনার পেয়ালায় একেবারে উপচে পড়া জীবন সুধা। কিন্তু জীবনের গ্রাফ বড় বেয়াড়া হয়। ওপরে উঠতে উঠতে হঠাৎ বাঁক নিয়ে নীচে নামে।

(চলবে)

ঐতিহ্যময় শহর চন্দননগরের স্থায়ী বাসিন্দা **সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়** বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির স্নাতক। ১৯৯৬ সালে প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় "দিবারাত্রির কাব্য" পত্রিকায়। ২০০১ সালে "দেশ" পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। 'আনন্দবাজার', 'বর্তমান', 'আজকাল', 'প্রতিদিন', 'তথ্যকেন্দ্র', 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' ছাড়াও, 'অনুষ্টুপ', 'কুঠার', এবং 'মুশায়ারা'-র মতো বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনেও তার কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রকাশের ধারা অব্যাহত। প্রকাশিত উপন্যাস পাঁচটি, গল্পগ্রন্থ তিনটি, এবং কবিতার বই একটি।

বাতায়ন

BALCONY

The English publication from Batayan group
April 2021

Inaugural issue of Balcony now available for purchase as a Digital Download !!

Over the years, Batayan has always sought to include contributions in both English and Bengali, making it a truly multicultural and a uniquely cross-lingual magazine. The popularity of the English Section of Batayan has soared over time, so much so that we are now proud to announce the inaugural issue of Batayan's entirely English edition – "Balcony".

This very special first edition of Balcony has been lovingly put together by our guest editor Prof. Krishna Sen, from Perth, Western Australia.

We are proud to feature contributions from indigenous and first nation writers such as Alf Taylor and Robert Mast there are stories, poems, travelogues, essays and a very special translations from Srijato's "*Tara bhora akasher niche*" – "Under the starry sky".

We are offering digital pdf download of this edition for a nominal fee of US$3.00.

Please follow the link below to purchase and download the digital copy and support Batayan's new venture – Balcony.

https://payhip.com/b/xa4j

এক বাক্স চকলেট Batayan Inc প্রকাশনার নতুন বই নানা স্বাদের গল্প ও রম্যরচনায় জমজমাট

আপনার copy পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন আমাদের দপ্তরে ।
আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া সহ অন্যান্য দেশেও পাওয়ার ব্যবস্থা আছে ।
যোগাযোগের বিবরণ – সুব্রত মিত্র (৯৪৩২০৮৬৫৮৪) অথবা kajalneo@gmail.com